ভে ত রে

ভারত সরকারকে অবশ্যই নীরবতা ভাঙ্গতে হবে ... ২
প্রতিপত্তি বাড়ছে ক্ষমতার শাসানিতে ৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি ৪
ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দ্বন্দ্ব ঃ ৫
রেল শ্রমিক ও যাত্রী সাধারণের চোখে ৬
... বিরোধী মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে ... ৭

গণদাবী

₹২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ২৩ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৪ জুলাই ২০১৪

ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের আক্রমণ

গাজার ওপর ইজরায়েলি বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রায় ১০০ বিক্ষোভকারী ১৪ জুলাই আওরঙ্গজেব রোডের হোটেল ফ্ল্যারিজেস-এর সামনে জড়ো হয়েছিলেন। জে এন ইউ এস ইউ, এ আই এস এ, এ আই এস এফ, আর ওয়াই এ, এন এ পি এম, ডি এস জি এবং আরও কিছু নাগরিক সমাজ সংগঠনের সদস্যরা হোটেল ফ্ল্যারিজেস থেকে ইজরায়েলি দূতাবাসের দিকে যাচ্ছিলেন। বাসটা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাতে বেরোতে না পারে তার জন্য পুলিশ সার্বিক চেষ্টা চালায়। বাসটিকে অবশেষে দূতাবাসের ২ কিলোমিটার আগে থামানো হয় এবং প্রতিবাদকারীরা সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দূতাবাসের দিকে এগোতে থাকেন। দূতাবাসের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে তাদের আটকানোর চেষ্টা করে এবং কিছু ছাত্র দূতাবাসের কাছে যেতে পারলেও সেখানে তাদের শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ণা চালাতে দেওয়া হয় না। মহিলা প্রতিনিধিকারীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়, আর পুরুষ প্রতিবাদকারীদের মারধোর করা হয় যার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হয়। প্রতিবাদকারীদের একটি বাসে তুলে তুঘলক রোড থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাদের গালাগালি দেওয়া হয় এবং তাদের সঙ্গে বিদ্বেষমূলক আচরণ করা হয়। থানার ডি সি পি-র নির্দেশেই এই ধরণের আচরণ প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে করা হয়।

এ আই পি ডব্লিউ এ-র সম্পাদক এবং সি পি আই (এম এল)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কবিতা কৃষ্ণানকে এক মহিলা পুলিশ টেনে নিয়ে গিয়ে হেলমেট দিয়ে মুখে আঘাত করেন। থানায় তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না। জে এন ইউ এস ইউ-র প্রেসিডেন্ট আকবর চৌধুরী গালাগালির প্রতিবাদ করলে তাকে থাপ্পড় মারা ও গালাগালি দেওয়া হয়। পুলিশ থানার মধ্যে দাড়িওলা ছেলেদের বেছে নিয়ে (মুসলিম মনে করে) তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চায়।

উল্লেখ্য, তার আগের দিন দূতাবাসের সামনে অন্যান্য প্রতিবাদকারীদের বিক্ষোভ চালাতে দেওয়া হলেও জে এন ইউ-র ছাত্রদের বেছে নিয়ে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা এবং মারধোর করা হয়। পুলিশ বলছিল—ওদেরকে ছেড়ো না, ভালো শিক্ষা দাও, ওরা বারবারই বিক্ষোভে নামে।

আটক শেষ হওয়ার পর এ আই এস এফ-এর

দুয়ের পাতায় দেখুন

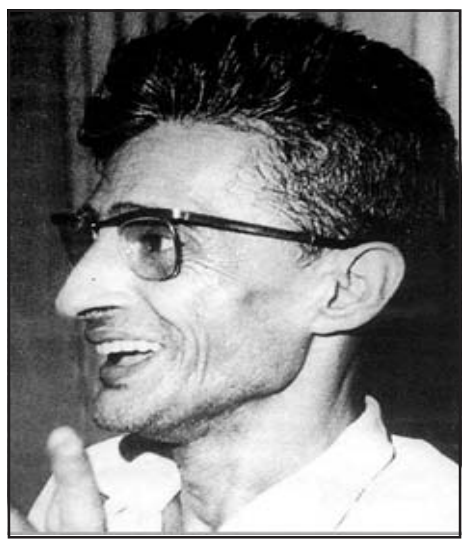

নকশালবাড়ী আন্দোলন তথা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিপ্লবী ধারার পথিকৃৎ এবং সি পি আই (এম এল)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক কমরেড চারু মজুমদারের ২৮ জুলাই ৪৩তম শহীদ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধিক্কার !

২৩ জুলাই '১৪, সংসদের ক্যান্টিন হল, নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে ধূয়ো তুলে আই আর সি টি সি ক্যাটারিং-এর ম্যানেজারকে গায়ের জোরে রুটি খাওয়ালেন ১১ জন শিবসেনা সাংসদ! ক্যাটারিং ম্যানেজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তিনি রমজান মাসের উপবাস পালন করছেন বলে শিবসৈনিক সাংসদদের বারবার নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কোন আবেদনেই সেনা-সাংসদরা বিরত হন নি, উপরন্তু ক্ষমতার দাপট উপভোগ করেছেন! প্রতিবাদে বিরোধীরা উত্তাল হলে এক বিজেপি সাংসদ মারমুখী হয়ে তেড়ে এসে বলতে থাকেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত! স্তম্ভিত করে দেওয়ার ঘটনা! উত্তরোত্তর এই হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় পরিস্থিতি প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে পড়লে বিজেপি নেতা ভেঙ্কাইয়া নাইডু আপাত ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে প্রতিক্রিয়া দেন, তাঁদের দলের সাংসদ যে কথা বলেছেন সেটা দলের সরকারি ভাষ্য নয়। ভেঙ্কাইয়া পাল্টি খাওয়ার কী খেল্ দেখাচ্ছেন! স্বয়ং মোদীই বিগত লোকসভা নির্বাচনী প্রচারে একাধিকবার প্রকাশ্যে হুমকি শুনিয়েছিলেন, 'সুদিনের' সরকার আসছে, সংখ্যালঘুরা সব তৈরী থাকুক তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য! তারই মহড়া কী শুরু হয়ে গেল একেবারে সংসদের ভেতর থেকে! রাজনৈতিক মহলে এখন এটাই প্রশ্ন। ধিক্কার এই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী আচরণকে! ধিক্কার!

বাজেটে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে বিপুল ছাড়

২০১৩-১৪ বর্ষে যে পরিমাণ রাজস্ব ছাড় দেওয়া হল তাতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প চালানো যেত তিন দশক অথবা গণবণ্টন ব্যবস্থা চালানো যেত সাড়ে চার বছর

২০১৩-১৪ বর্ষেও কারবার যথারীতি অব্যাহত রইল। বাজেট নথি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ বছর আমরা দীনহীন কর্পোরেটদের এবং অপুষ্টিতে ভোগা ধনীদের আরও ৫.৩২ লক্ষ কোটি টাকা দান করছি। নথিতে অবশ্য ৫.৭২ লক্ষ কোটি টাকার কথা বলা আছে, তবে আমি এর থেকে ০.৪০ লক্ষ কোটি টাকা বাদ দিচ্ছি, কেননা ঐ ছাড় ব্যক্তিগত আয়কর বাবদ ব্যাপক সংখ্যক মানুষকেই সুবিধা দেবে। বাকিটা মূলত গিলতে আকুল কর্পোরেট ক্ষেত্রের জন্য। এর সঙ্গে অবশ্যই ধনবানদের জন্য যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগটাই প্রত্যক্ষ কর্পোরেট আয়কর, আমদানি শুল্ক এবং উৎপাদন শুল্ক বাবদ।

আপনার যদি মনে হয় যে অতি ধনীদের কর ও শুল্ক বাবদ ৫.৩২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড় মাত্রার দিক থেকে সামান্য বেশি, তবে আপনাকে আর একবার ভাবতে বলব। এই একই খাতে ২০০৫-০৬ বর্ষ থেকে যে ছাড় তাদের দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ ৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি (এর ছ-ভাগের একভাগ শুধুই কর্পোরেট আয়কর বাবদ)। অর্থাৎ, গত ৯ বছরে আমির-ওমরাহদের জন্য ৩,৬৫,০০,০০,০০,০০০ টাকা উড়ে গেছে। পরিমাণটা অতএব ৩৬.৫ ট্রিলিয়নে দাঁড়াচ্ছে আর ঐ টাকা দিয়ে আমরা যা করতে পারতাম তা হল—

● বর্তমান স্তরে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ১০৫ বছর ধরে অর্থ যোগানো যেত। অর্থাৎ, একটা মানুষ যতদিন বাঁচার আশা করে তার চেয়েও বেশি। আর একজন কৃষি শ্রমিক যতদিন বাঁচার আশা করে তার চেয়েও তো আরও অনেক বেশি। বস্তুত ঐ টাকায় ঐ ধরণের শ্রমিকদের দুই প্রজন্মের শ্রম জীবনের জন্য এম এন আর ই জি এস-কে চালানো যেত। ঐ প্রকল্প বাবদ বর্তমান বরাদ্দের পরিমাণ ৩৪০০০ কোটি টাকা।

● ঐ টাকায় গণবণ্টন ব্যবস্থাকে চালানো যেত ৩১ বছর (বর্তমানে এই প্রকল্পে বরাদ্দ ১১৫০০০ কোটি টাকা)।

আর, এই পরিমাণ রাজস্ব আদায় হলে তার ৩০ শতাংশ রাজ্যগুলো পেত। কেন্দ্রের বিপুল পরিমাণে কর্পোরেট কর মাফ করার ফলে রাজ্যগুলোর আর্থিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শুধু ২০১৩-১৪ বর্ষের জন্য যে ছাড় দেওয়া হল তা দিয়ে গ্রামীণ কর্ম প্রকল্পকে চালানো যেত ৩০ বছর। কিংবা গণবণ্টন ব্যবস্থাকে চালানো যেত সাড়ে চার বছর। এই ছাড়ের পরিমাণ এমনকি তেল বিক্রয়কারী কোম্পানিগুলোর ২০১২-১৩ বর্ষে তথাকথিত 'কম আদায়' বাবদ যে 'লোকসান' হয়েছিল তার চার গুণেরও বেশি।

আমদানি শুল্কে প্রদত্ত কয়েকটি ছাড়ের দিকে তাকান। 'হীরে ও সোনা' বাবদ ছাড়ের পরিমাণ হল একেবারে ৪৮৬৬৫ কোটি টাকা। এটা কখনই আম আদমি বা আম রমণীর ব্যবহারের জিনিস নয়। এটা আবার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য যা ব্যয় করি তার চেয়ে বেশি। একটি তথ্য ঃ গত ৩৬ মাসে হীরে ও সোনায় প্রদত্ত ছাড়ের পরিমাণ হল ১.৬ ট্রিলিয়ন টাকা (যেটা আগামী বছর গণবণ্টন ব্যবস্থায় যা ব্যয় করা হবে তার চেয়ে বেশি)। সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ি, এই পরিমাণ হল মোট রাজস্ব ছাড়ের ১৬ শতাংশ।

২০১৩-১৪ বর্ষের জন্য বাজেটে ৫.৭ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব ছাড়ের যে ভাগ-বিন্যাস করা হয়েছে তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। এর মধ্যে ৭৬১১৬ কোটি টাকা শুধুই প্রত্যক্ষ কর্পোরেট আয়কর বাবদ। এর প্রায় দু-গুণেরও বেশি (১৯৫৬৭৯ কোটি টাকা) ছাড় দেওয়া হয়েছে উৎপাদন শুল্কে। এবং তিন গুণেরও বেশি (২৬০৭১৪ কোটি টাকা) জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে আমদানি শুল্ক বাবদ।

'সংস্কার' পর্বে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাপারটা চলছে। তবে বাজেটে কর ছাড়ের এই হিসেবটা দেওয়া হচ্ছে ২০০৬-০৭ বর্ষ থেকে। আর তাই এর যে পরিমাণটা আমাদের কাছে রয়েছে তা হল ৩৬.৫ ট্রিলিয়ন কোটি টাকা। আগের বছরের হিসেবগুলো থাকলে ঐ পরিমাণ আরও বেশি হত (এর গোটাটাই অবশ্যই ইউ পি এ-র শাসনকালে)। এই প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাজেট নথিতেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ''কেন্দ্রীয় কর বাবদ মোট রাজস্ব ছাড়ে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।''

এটা একেবারেই সঠিক কথা। ২০১৩-১৪ বর্ষে প্রদত্ত ছাড় ২০০৫-০৬ বর্ষে প্রদত্ত ঐ একই ছাড়ের ১৩২ শতাংশ। কর্পোরেট কর ছাড় এক বর্ধিষ্ণু শিল্প এবং যথেষ্ট নিপুণ শিল্প। **- পি সাইনাথ-এর প্রতিবেদন থেকে**

সম্পাদকীয়

শয়তানীর দুই কৌশল

পুলিশ-প্রশাসন অবশেষে উত্তর চব্বিশ পরগণার বামনগাছিতে 'শান্তি মিছিল' করল। আসলে এটা সরকারের নির্দেশে করানো হল। নাটকটা নামানোর ছক ছিল, তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের ঠিক আগের দিন নাটকটা পথে নামিয়ে দেওয়া হল। যাতে স্থানীয় তৃণমূলী পঞ্চায়েত সদস্য ও কলকাতার দাদাদের মদতপুষ্ট লুম্পেন বাহিনীর হাতে নিহত সৌরভের মৃত্যুর ইস্যু পরের দিন তৃণমূলের বছরকার শক্তি প্রদর্শনের দিবসে মিডিয়ায় কোনও প্রশ্ন হিসেবে ভেসে উঠতে না পারে। ইতিমধ্যেই সৌরভ হত্যাকারিদের ও তাদের মদতদাতাদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বামনগাছিতে সুঁটিয়া-কামদুনির মতন ''প্রতিবাদী মঞ্চ'' গড়ে উঠেছে। ঐ মঞ্চ সৌরভ হত্যার পুনরাবৃত্তি রোধের অঙ্গীকারেও বদ্ধপরিকর। প্রহসনের কথা হল, প্রতিবাদী মঞ্চ বা সৌরভের গ্রাম কুলবেড়িয়ার কোনও মানুষকে পুলিশ-প্রশাসন তাদের 'শান্তি মিছিলের' নাটক প্রদর্শনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর নৈতিক সাহস দেখাতে পারেনি। পারাটা সম্ভবও ছিল না, কেননা দীর্ঘদিন যাবত অভিযোগ জানিয়ে আসা সত্ত্বেও পুলিশ-প্রশাসন যে উপেক্ষার মস্করা করে এসেছে, এমনকি সৌরভ হত্যার পরেও নিহতের ময়না তদন্ত কোথায় হচ্ছে তার হদিশ পাওয়া, শবদেহ পাওয়ার প্রশ্নে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেওয়া ও তাদের গ্রেপ্তার করতে আগ্রহী হওয়ার প্রশ্নে যে নিদারুণ হয়রানি আর কূটকচালি করেছে; তারপর আর ''প্রতিবাদী মঞ্চ'', সৌরভের গ্রাম ও পরিবারকে 'শান্তি মিছিলে'র নাটকে আসতে বলার মুখ থাকেনি। সেটা বলতে গেলে ধিক্কারের মুখঝামটা শুনতেই হোত, প্রত্যাখ্যানের জবাব অনিবার্যই ছিল। পুলিশ-প্রশাসন তাই বেশরম অবস্থা আড়াল করতে ''প্রতিবাদী মঞ্চের'' যে জনৈক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ছিল বলে দাবি করেছে তা আদ্যন্ত ভুয়ো। বরং মিডিয়ার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে 'শান্তিমিছিলে' পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের পাশাপাশি হাঁটছে কয়েকজন অভিযুক্তও। মিডিয়ার ছবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মানহানি মামলা করার সাহসও পুলিশের হয়নি। তার মানেই, অপরাধীদের নিয়েই পুলিশ-প্রশাসনের চলমান পথনাটকের প্রদর্শন ছিল সেটাই প্রমাণিত হল। মিডিয়ার ক্যামেরায় ঐ নাটুকে মিছিলের যে সমস্ত লেখা প্ল্যাকার্ড ধরা পড়েছে তার একটাও নির্দিষ্ট অভিযুক্তদের উদ্দেশ্য করে নেই। কারা ঐ অঞ্চলে যাবতীয় অপরাধে অভিযুক্ত, তাদের মদতদাতা কারা, সবই স্থানীয় জনতার বহুল পরিচিত, চর্চিত। অথচ সরকারি 'শান্তিমিছিলে' অশান্তির কারণগুলোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এলাকায় অচেনা ভাড়াটিয়া ও অপরিচিত লোকেদের আনাগোনার প্রতি। তদন্ত ও প্রতিবাদের স্থানীয় গণচেতনাকে নস্যাৎ করে দিতে এবং এলাকা বহির্ভূত সমস্ত উদ্বেগ-উস্মাকে বিপথগামী করতেই ঐ প্ল্যাকার্ড-শ্লোগান লিখনে চাতুরির পন্থা নেওয়া হয়েছে।

সুঁটিয়া থেকে কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চগুলোকে ভাঙ্গতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বারবার তোপ আর টোপ দেখিয়ে আসছে। একটা সময়ে এসে খোদ শাসকদল পুতুল 'প্রতিবাদী মঞ্চ' বানিয়েছে, সাজানো মিছিল মিটিং নামাতে শুরু করেছে। এই কায়দার কার্পণ্য বামনগাছিতেও রাখা হয়নি। সাতদিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বামনগাছিতে হেভিওয়েটের সভা করেছে। এমনকি নিহত সৌরভের পরিবার কলেজে সৌরভ কোনদিন টি এম সি পি করেনি দাবি করলেও জোড়াফুলের পার্টির ছাত্রসংগঠনের পয়লা নম্বর দাদাটি সৌরভকে সদস্য দাবি করে একটি ছবি তৃণমূলের সভায় প্রকাশ করেছে! দাদার কীর্তি যে সুপার ইম্পোজের সে আর বুঝতে কার বাকী আছে। রাজ্যের শাসকদল যে কত নোংরামীতে নামতে পারে এ তার এক দৃশ্যমান নজীরখণ্ড মাত্র। এখন দেখা যাচ্ছে, শাসকদলের 'শান্তিমিছিল' নামানোর নাটকেই তৃণমূল থেমে থাকছে না, 'শান্তিমিছিল' নামাতে শুরু করেছে সরাসরি পুলিশ-প্রশাসনকে। এক ঢিলে দুই পাখী মারতে। 'অশান্তি সৃষ্টি হবে' বাহানা দেখিয়ে বিরোধী প্রতিবাদী উদ্যোগকে পথে নামতে না দেওয়া, তার ওপর শাসকদল-পুলিশ-প্রশাসনকে 'শান্তি' কায়েমের নাট্য পরিবেশনে নামিয়ে চলা। শয়তানীর দুই কৌশল।

হিন্দমোটরস্ কারখানা খোলার দাবিতে গণকনভেনশন

১৭ জুলাই হিন্দমোটরস্ কারখানার বাইরে সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে হিন্দমোটর কারখানা দ্রুত খোলা, কর্মীদের বকেয়া মেটানো এবং সমস্যা সমাধানে সরকারের উদ্যোগের দাবিতে এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনটি ফ্যাক্টরি গেটে হওয়ার কথা থাকলেও পুলিশ প্রশাসন অনুমতি দেয়নি, সেই কারণেই গেটের থেকে কিছুটা দূরে ফ্যাক্টরি ও রেললাইনের মধ্যবর্তী এক জায়গায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে এস এস কে ইউ-এর সম্পাদক আভাস মুন্সি গণকনভেনশনের প্রস্তাব পাঠ করেন। প্রথম বক্তা ছিলেন এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষ থেকে প্রদীপ সরকার, তিনি প্রস্তাব সমর্থন করে দাবিগুলোর সমর্থনে রাজ্যজুড়ে এক সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। বি এম এস, সিটু, সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়ন, ইউ টি ইউ সি, আই এফ টি ইউ, গণউদ্যোগ, এন জে এস ইউ এবং গণমোর্চার পক্ষে রেজ্জাক মোল্লা, প্রসেনজিৎ বসু সহ সমস্ত বক্তাই ঐক্যবদ্ধভাবে ও রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে বলেন। কনভেনশনে সংগঠনের সভাপতি অভিতাভ ভট্টাচার্য বলেন, আগামী মাসের শুরুতে সমস্যার সমাধান না হলে রেল রোকো, রাস্তা অবরোধের মতো আন্দোলন করতে বাধ্য হবো। আই এন টি টি ইউ সি-কে ডাকা হলেও তারা কনভেনশনে উপস্থিত থাকেনি।

ভারত সরকারকে অবশ্যই নীরবতা ভাঙ্গতে হবে গাজায় ইজরায়েলের বর্ণবাদী গণহত্যাকাণ্ডকে বন্ধ করার দাবি তুলতে হবে

গাজায় ইজরায়েলের হামলায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন প্যালেস্তাইনের নাগরিক মারা গেছেন, মৃত্যুর সংখ্যা রোজই বেড়ে চলেছে। অধিকৃত ওয়েস্টব্যাঙ্কে তিনজন যুবককে অপহরণ ও হত্যার ঘটনা নিন্দাজনক। কিন্তু দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার বদলে ইজরায়েল এই অপরাধকে অজুহাত খাড়া করে আর একবার প্যালেস্তিনীয় নাগরিকদের হত্যা করছে।

এই অপহরণ ও হত্যার ঘটনাকে যে নিছকই এক অজুহাত হিসাবে খাড়া করা হয়েছে তা বোঝা যায় ইজরায়েলের কট্টরপন্থীদের এই কথা থেকে যে প্যালেস্তিনীয় নাগরিকদের ওপর বাৎসরিক হত্যাকাণ্ড চালানোটা হল ''ঘাস কেটে বাগানকে পরিষ্কার করার মতো''। প্যালেস্তিনীয় নাগরিকদের মানুষ হিসাবে গণ্য না করা এবং এখানে দখল ও হত্যাকাণ্ড চালানোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য এই ধরণের কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে ইজরায়েলের রাজনৈতিক নেতাদের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৯৬৯ সালে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়র ঘোষণা করে যে, ''প্যালেস্তাইনবাদী বলে কোন কিছু নেই''। ১৯৮২ সালে ইজরায়েলের আর এক প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন প্যালেস্তাইন নাগরিকদের ''দু-পায়ে হাঁটা জন্তু'' হিসাবে বর্ণনা করে। ১৯৮৮ সালে অন্য আর এক প্রধানমন্ত্রী ইতিঝাক সামির ঘোষণা করে যে প্যালেস্তাইন নাগরিকদের ''ফড়িংদের মতো মারা হবে।''

ইজরায়েলের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে বিশ্বের শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো নীরবতা পালন করে চলেছে আর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছে, ''দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদের থামাতে পারবে না, আমাদের আরও অনেক কিছু করা বাকি আছে।'' ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বাড়ি, হাসপাতাল ও মানুষের বসবাসের জায়গাগুলোতে বোমাবর্ষণকে খোলাখুলি ও নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। যুদ্ধ অপরাধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই ঘোষণার পরও গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের দিক থেকে কোন ধরণের সিরিয়াস পদক্ষেপই করা হয়নি, যদিও রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গাজায় যারা নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই হল নিরীহ নাগরিক।

বর্তমান গণহত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারত সরকারের নীরবতা হল প্যালেস্তিনীয়দের সংগ্রামের প্রতি ভারতের সংহতি প্রদর্শনের দীর্ঘ ইতিহাসকেই বিদ্রূপ করা। প্যালেস্তিনীয়দের প্রতি ভারতের এই সংহতির ভিত প্রোথিত হয়েছে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে। সেই জন্যই গান্ধী সহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একবাক্যে প্যালেস্তাইনের ওপর ঔপনিবেশিক দখলদারির নিন্দা করেন ও এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। গান্ধী ঘোষণা করেন, ''ইংল্যাণ্ড যেমন ইংরাজদের বা ফ্রান্স যেমন ফরাসীদের, ঠিক তেমনি প্যালেস্তাইন হল আরববাসীদের''। এটাই হল প্যালেস্তাইনের প্রতি ভারতের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত মনোভাব। বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতের শাসক শ্রেণী যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জমানার ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, ততই তারা ইজরায়েলের সঙ্গে 'প্রয়োজনবাদী' সম্পর্কের পক্ষে ওকালতী করছে। বিগত এন ডি এ সরকারের সময়কালে এই সম্পর্ক এমনকি মতাদর্শগত ঘনিষ্ঠতার রূপ নেয়, যেখানে জিয়নবাদ ও হিন্দুত্ব পরস্পর ইসলাম-বিদ্বেষের প্রতিধ্বনী তোলে। ইজরায়েলি অস্ত্রের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার হিসাবে ইজরায়েল ও ভারতের শাসকদের মধুর সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তোলাটাই হল ভারতের অবস্থান, তা কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েরই জমানায়। এখন মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংঘ পরিবারের ক্যাডাররা ভারত ও প্যালেস্তাইনের মধ্যকার শক্তিশালী ঔপনিবেশিকতা বিরোধী বন্ধনের স্মৃতি ও ঐতিহ্যকে মুছে ফেলতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা এই উপমহাদেশে ইজরায়েলের ছাঁচে ভারতকে গড়তে চাইছে—তা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হোক আর দেশের মধ্যেকার সংখ্যালঘু জনগণ ও নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলোর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রেই হোক।

এইরকম সময়ে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যারা ইজরায়েলের আগ্রাসন ও দখলদারির প্রতিবাদ করছেন সেই সমস্ত সাধারণ ভারতীয়রা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের নিজস্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের মহত্তম ঐতিহ্যকেই বহন করছেন। তারা দুনিয়াজুড়ে সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষদের পক্ষেও দাঁড়িয়েছেন যারা ইজরায়েলী দখলদারীর সমর্থনকারী নিজেদের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং ইজরায়েলকে বয়কট, সেখানে করা লগ্নী প্রত্যাহার করে নেওয়া ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দাবি তুলেছেন।

ভারতের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের মূল্যবান ঐতিহ্য ও প্যালেস্তাইন সম্পর্কে বিবেকসম্পন্ন বৈদেশিক নীতিকে ভারত সরকারের দ্বারা ধ্বংস করাটা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয়দের অবশ্যই দাবি তুলতে হবে—ভারত সরকারকে ইজরায়েলী আগ্রাসনের নিন্দা করতে হবে ও এই আগ্রাসনকে অবিলম্বে থামাবার জন্য বলতে হবে, প্যালেস্তিনীয় জনগণের জন্য ত্রাণ পাঠাতে হবে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য হস্তক্ষেপ করতে রাষ্ট্র সংঘের কাছে আবেদন করতে হবে। ভারত সরকারকে অবশ্যই মুক্ত প্যালেস্তাইনের স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং ইজরায়েল থেকে অস্ত্র কেনা বন্ধ করে সেই দায়বদ্ধতা কার্যকরী করতে হবে।

আজকে প্যালেস্তাইন হল উপনিবেশিবাদ, দখলদারি ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে জনগণের এ পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ প্রতিরোধ সংগ্রাম। এটা পরিহাসের ব্যাপার যে, ইজরায়েল রাষ্ট্র, যে কিনা নাজী বর্ণবাদ ও গণহত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক স্মারকস্তম্ভস্বরূপ, সেই কিনা আজকের দুনিয়ায় ঘৃণ্য বর্ণবাদী অনুশীলন ও গণহত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ণবাদী দখলদারি ও গণহত্যাকে বন্ধ করাটাই আজ বিবেকবান মানুষদের আহ্বান।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১৫ জুলাই ২০১৪)

... বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের আক্রমণ

একের পাতার পর

দুজন কর্মী যখন বাড়ি ফিরছিলেন, থানার বাইরে তাদের ধরা হয় এবং একজনকে মারধোর করা হয়। কোন ধরণের প্ররোচনা ছাড়াই দুজন নাগরিকের ওপর এই ধরণের নিগ্রহ চালানো হল। এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ব্যাপার যে, ভারতের বর্তমান যে কেন্দ্রীয় সরকার ইজরায়েলপন্থী বলে পরিচিত, তারা গাজার ওপর ইজরায়েলি যুদ্ধের কোন নিন্দা তো করেইনি, উল্টে বর্ণবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের ওপর প্রবল উৎসাহে দমন নামিয়ে আনছে। এ সত্ত্বেও ন্যায় ও গণতন্ত্রের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাবে না।

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

প্রতিপত্তি বাড়ছে ক্ষমতার শাসানিতে চাকচিক্য তারকা প্রসাধনীতে

মানুষের কৌতূহল ছিল চাপা। তৃণমূলের ‘একুশে’র স্মরণ মঞ্চ থেকে নেত্রী এবার কি বার্তা দেন! নতুন কোন উন্নয়নের চমক, অথবা সংঘাতের জন্য তৈরী হওয়ার হাঁকডাক! আর কদিন বাদে নেত্রী দিল্লী যাবেন, তবে জানিয়ে দিলেন যাবেন ব্যক্তিগত কাজে। অতএব তাঁর পরবর্তী রাজধানী গমনের সাথে আর যাই হোক, কেন্দ্রের সাথে সংঘাতে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। রেল ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে তৃণমূল সংসদে কিছু আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ আর কলকাতায় কিছু সাজানো মিছিল ছাড়া কিছুই করেনি। বরং মোদী সরকারের আনা বিল-টিল (‘ট্রাই’) সমর্থন করেছে। সাধারণ বাজেট নিয়ে বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাটে যায়নি। বিশেষ করে খাদ্য সুরক্ষা এবং এম এন আর ই জি এ অধিকারের ওপর যখন আক্রমণ নামানোর ফন্দী আঁটা হচ্ছে। মোরাটোরিয়াম পাওয়া সংক্রান্ত বিতর্ককে ফেলে রেখেছে মাঝমাঠে। পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এক মূল্যবৃদ্ধির জেরেই জনজীবন জেরবার। তার উপর ক্রমবর্ধমান বেকারি। লাইন দিয়ে রয়েছে আরও সব গুরুতর বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ছবি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও ঘটমান কিছু ভয়ঙ্কর ইস্যু প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সোচ্চার হওয়ার দাবি জানায়। যেমন, প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলী বর্বরতা। কিন্তু এসব প্রশ্নে কোথায় টি এম সি? লোকসভা ভোটের আগে মুজফফরনগর বানানো কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী বিজেপির বর্তমান বিদেশমন্ত্রী সাহেবা ডেঁটে বলছেন, প্যালেস্তাইনের প্রতি দরদ দেখানোর জন্য ভারতীয় সংসদ, ভারত সরকার ইজরায়েল-বিরোধী প্রস্তাব-নিদান নেবে না, ইজরায়েলের সাথে সম্পর্ক খারাপ করবে না। ঐসব দেখে-শুনেও তৃণমূল সংসদে করছেটা কী? তৃণমূলনেত্রীর কণ্ঠস্বর কৈ? নীরবতার হেতুটা কি! তবে কি এপ্রশ্নে মোদী সরকারের গৃহীত অবস্থানের পেছন পেছন! ‘একুশে’র বক্তব্য থেকে জানার এরকম আরও অনেক কৌতূহল ছিল। কিন্তু নেত্রী এসব প্রশ্নের ধারকাছ দিয়ে গেলেন না।

তিন বছরের তৃণমূল শাসনে পশ্চিমবাংলা শান্তিতে নেই, স্বস্তিতে নেই। মমতা সরকারের মাথায় কোনো ‘মা-মাটি-মানুষের’ পালক জুটছে না। ক্ষমতালোভী আর চাটুকারদের কথা আলাদা। এরা তো ক্ষমতার চারপাশে ভনভন করতেই থাকে, থাকবে। কিন্তু আমজনতার মনের ভাব! হয় ধূমায়িত অসন্তোষ, নয়তো উগ্‌রে দেওয়ার সময় নিচ্ছে ক্রোধ। মানুষজন হিসেব কষছে, কি চেয়েছিলাম, আর কি সব দেখছি। মেহনতী মানুষেরা বিশেষ করে কৃষিজীবী জনতা এই সরকারের প্রতি আবেগে নতুন আবেগ যোগ করার অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না। বরং কাটাছেঁড়া করছেন নীরবে বা সরবে। চিন্তার জগতে দেখা দিচ্ছে দ্বন্দ্ব, তাড়া করছে সংঘাত। আসলে চলছে কোন্‌টা? মুখ্যমন্ত্রীর গলাবাজী করা ‘মানুষের দল’, নাকি শাসকের দলতন্ত্র? ‘সুশাসন’, নাকি সন্ত্রাসের রাজত্ব? ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্পের নামে অল্পবয়সী মেয়েদের সাইকেল বিতরণ আর এককালীন শিক্ষা অনুদান না হয় চলছে। কিন্তু নারীর ওপর ক্রমবর্ধমান যৌন হিংসার প্রশ্নে, দ্রুত বিচার ও শাস্তিবিধানের ব্যাপারে শাসকের নির্বিকার থাকা ও লঘু করে দেওয়ার আচরণ! ‘যুবশ্রী’ দিবস ও প্রকল্প পালনের ঢক্কানিনাদ, পথের কাঁটা মনে করে পরের পর যুবক তথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হত্যা করা, শাসকদলের স্থানীয় পেশীশক্তিকে প্রকাশ্যেই মদত দেওয়া, বিরোধীদের শায়েস্তা করতে পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া আর শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেওয়া থেকে বিরত রাখা; তোলারাজ-সিণ্ডিকেটরাজের সাথে শাসকদলের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না বলে লম্বাচওড়া ভাষণ মারা, অথচ সবই যেথায় যেমন খুল্লামখুল্লা চলছে একেক নেতার সুবেদারীর দৌলতে, তার জন্য খুনখারাবিও চলছে পাল্লা দিয়ে। সারদা আর্থিক লুঠমারকাণ্ডের প্রকৃত সত্যকাহিনী উন্মোচন করতে শাসকদল ইচ্ছুক? সদিচ্ছার কোনও প্রমাণ দাবি করতে পারছে না। বরং সারদাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে থাকা শাসকদলের তালেবর নেতাদের এমনকি নেত্রীর সাথে ডাঁয়ে-বাঁয়ে লেপ্টে থাকা ডাকসাইটে নেতাদের আড়াল করতেই তদন্তের মুখ ঘুরিয়ে দিতে দলনেত্রী মরীয়া। তাঁর চোখে সবই ‘ছোট্ট ঘটনা’! ‘সাজানো ঘটনা’! কেবল ‘কুৎসা’ আর অপপ্রচার’! যত ধ্রুব সত্য সব মানতে হবে কেবল মুখ্যমন্ত্রীর অনৃতবাণী থুড়ি নেত্রীর ‘অমৃতবাণী’কে! এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক তৈরী হচ্ছে গান গাওয়াটা ভণ্ডামীর। ভয়ঙ্কর বাস্তবতাটা হল একশ দিনের মজুরি আত্মসাৎ হচ্ছে, কাজের প্রকল্প গোটানো হচ্ছে। স্থায়ী কর্মসংস্থানের শর্ত সৃষ্টির ভাঙ্গা রেকর্ড বাজানোর বিরাম নেই। কিন্তু সেই কাজের দেখা নাই। শোনানো হচ্ছে ধানমাণ্ডি তৈরীর ভাবনার কথা, টেণ্ডার নেওয়া হবে মাণ্ডি পিছু ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে রাজী হওয়া একচেটিয়া পুঁজির রাঘব-বোয়ালদের থেকে। বাস্তবে চাষিকে ফসলের অভাবী বিক্রীর দুর্বিপাক থেকে রেহাই পেতে সহায়তা দেওয়া হয় না। চাষির অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা তিন বছরে সংখ্যায় আশি ছাড়িয়ে গেলেও সরকার এই তেতো তথ্য মানতে নারাজ। শিল্পে নতুন বিনিয়োগের হারে রাজ্যওয়াড়ি তালিকায় বাংলা নাকি চার নম্বরে উঠে এসেছে! কিন্তু জেশপ, ডানলপ, হিন্দমোটর, শালিমার পরপর চার-পাঁচটা বহুদিনকার কারখানার ঝাঁপ যে শ্রমিকদের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। একটাও তো শ্রমিক আন্দোলনের জেরে নয়। মালিকপক্ষের দেওয়া তথাকথিত ‘লোকসানের’ অজুহাতে। শিল্পে কার্যত চলছে মালিকীরাজ। চা বাগিচা ক্ষেত্র ছারখার হচ্ছে। অনাহারে, অপুষ্টিতে পরের পর চা শ্রমিকেরা মারা যাচ্ছে, তাদের মজুরি লোপাট হচ্ছে। এমনকি গোটা উত্তরবঙ্গে মশকবাহী রোগে বেঘোরে মৃত্যু হল কয়েকশ মানুষের। মুখ্যমন্ত্রী কেবল শিল্পমন্ত্রী-শ্রমমন্ত্রীর তাস অদল-বদল করে চলেছেন। শিল্পে কর্মসংস্থান কৈ। সরকারি ক্ষেত্রে অঘোষিত গৃহীত প্রকল্প হল কর্মসংকোচন ও আউটসোর্সিং-এর সমন্বয়সাধন। যোগ্যতা থাকলেও বঞ্চনার শিকার হওয়া স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনশন আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছেন, আত্মঘাতী হচ্ছেন, অথচ সরকারের ভ্রূক্ষেপ নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বাইরে থেকে শংকুবাহিনীর দাপানি আর ভেতরে বশংবদদের গোলামী। মানবাধিকার কমিশনে বসানো হয়েছে নৈতিকতার প্রশ্নে পরাজিত দাসখত দেওয়া এক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে। নারী কমিশনে নয়া নিয়োগ হয়েছেন টলিউডের দুই অভিনেত্রী সহ আগ্রাসী তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী, যাদের কার্যত প্রাসঙ্গিক কার্যকরী কোন ভূমিকাই নেই। এর সাথে যোগ করুন এক কুখ্যাত পুলিশ অফিসারকে ক্লীন চিট দিয়ে পদোন্নতি ঘটিয়ে একটি বাছাই করা জেলায় পাঠানো হল। যে অফিসারটির বিরুদ্ধে বিগত বামফ্রন্ট আমল থেকে রিজওয়ানুর মৃত্যুকাণ্ডে প্ররোচনা সৃষ্টির দায়ে অভিযোগ ছিল, বরখাস্ত থাকা অবস্থায় বিভাগীয় তদন্ত চলছিল। হঠৎ তাঁকে ক্লীন চিট দেওয়া হল কীসের ভিত্তিতে? কোনও যুক্তিগ্রাহ্য, বিশ্বাসযোগ্য সরকারি বিবৃতি নেই। ‘মানুষের দল’, ‘মানুষের সরকার’ দাবি করার নামে মানুষের স্বার্থকে মাড়ানো হচ্ছে, মানুষকেই অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। বর্তমান শাসকদের কাছে রিজওয়ানুর কাণ্ডকে পুঁজি করে চলার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তার চেয়ে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারটিকেই অনেক বেশী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুপরিকল্পিত ডিল।

এই সমস্ত বিষয়গুলো জনজীবনে চর্চায় রয়েছে। মানুষজন দশদিক ভাবছেন। তৃণমূলের ‘একুশে’-র বার্তা কিন্তু এসব প্রশ্ন ছুঁয়েও গেল না। নেত্রী একদিকে দলকে ভব্য-সভ্য হয়ে ওঠার বার্তা দিলেন, অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগকে কুৎসা-অপপ্রচার বলে দম্ভ দেখাতে ছাড়লেন না। তাঁর বক্তিমের অর্ধেক ভাগ জুড়ে ছিল দলের তোলাবাজী-লবিবাজী-নির্বাচনী টিকিট—নেতা খোঁজাখুজি নিয়ে, আর শেষ কথা ছিল ক্ষমতাকে চম্‌কে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে দল। এখান থেকেই পরিষ্কার তৃণমূল সব কথার শেষে আসলে কি বার্তা দিতে চায়।

কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে আসার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কংগ্রেসের থেকে পৃথক কোনো ইতিহাস বা সংস্কৃতির দাবি করাও তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তৃণমূল মরীয়া কিছু নতুন চাকচিক্য আনতে। এই কারণেই শিল্পকলা-বিনোদন ও ক্রীড়াজগতের তারকাদের জড়ো করা, সামনে আনার ব্যাপারে খুব জোর দিচ্ছে।

কিন্তু যা একেবারেই অনভিপ্রেত সেটা হল বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলোতে একদিকে বিজেপিমুখী অন্যদিকে তৃণমূলমুখী ভাঙ্গন। এ এক কঠিন সময়, যা বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছে দাবি করে যুঝে ওঠার।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

হিন্দমোটরে তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যাকারীর শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

৪ জুলাই হুগলী জেলার উত্তরপাড়া থানা এলাকার হিন্দমোটর রাধাগোবিন্দনগরে ২৬ বছর বয়সী এক তরুণীকে ধর্ষণ করে হত্যা করে ঐ এলাকারই বাচ্চু ঘোষ। তরুণীটি আই টি সেক্টরের কর্মী ছিলেন এবং বাচ্চু এলাকাতেই একটি মুদিখানা দোকান চালাতো। ঘটনাটি এলাকাবাসীদের মাধ্যমেই পার্টির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নজরে আসে। পার্টি কর্মীরা ঐ কন্যাহারা পরিবারটির সাথে দেখা করতে যান। জানা যায় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ দায়সারাভাবে একবার ঐ ঘটনাস্থলে এলেও এই ধরণের ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকেই আইনানুগভাবে দোষীর বিরুদ্ধে যে ‘সুয়োমোটো মামলা’ দায়ের করার কথা তা আদৌ করা হয়নি। এছাড়া পরিবারটিও প্রাথমিকভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। ঐ এলাকার সি পি এমের প্রাক্তন কাউন্সিলার ও লোকাল কমিটির সদস্য রথীন পালের ভূমিকা নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন থেকেছে। আক্রান্ত তরুণীর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় সি পি এমের ঐ নেতা গোড়া থেকেই পরিবারটিকে বলতে থাকেন যে কেস করার দরকার নেই, অযথা জলঘোলা হবে। এরপর সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পক্ষ থেকে ঐ পরিবারটিকে তাদের ন্যায়সঙ্গত লড়াইতে শেষ পর্যন্ত পাশে থাকার সাহস জোগানোয় তারা পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানাতে উদ্যোগী হন। ১৩ জুলাই আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে উত্তরপাড়া থানায় বাচ্চু ঘোষের নামে ধর্ষণ ও খুনের মামলা ও রথীন পালের বিরুদ্ধে দোষীকে আড়াল করার মামলা করা হয়। ঐ দিনই সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির এক প্রতিনিধিদল তরুণীর পরিবারের সাথে দেখা করতে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন চৈতালী সেন, চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী, কস্তুরি, পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরিবারটিকে তারা জানিয়ে আসেন তাদের ন্যায়বিচারের দাবিতে এই লড়াইয়ের পাশে তারা সর্বোতভাবে থাকবেন। পুলিশ যেভাবে তরুণীর ধর্ষণ হওয়ার প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা চালাচ্ছে তার জন্য তারা উত্তরপাড়া থানার পুলিশ অফিসারদেরও শাস্তি দাবি করবে।

অবিলম্বে এই ঘটনা মূল অভিযুক্ত বাচ্চু ঘোষের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের মামলার দ্রুত চার্জ গঠন করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১৮ জুলাই পার্টির হিন্দমোটর-কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটির ডাকে প্রায় ৬০ জন মহিলা সহ দুই শতাধিক মানুষের জঙ্গী বিক্ষোভ ও থানায় গণডেপুটেশন সংগঠিত হয়। ডেপুটেশনের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সি পি আই (এম এল) জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, আঞ্চলিক নেতা প্রদীপ সরকার, নেত্রী পাপিয়া ঘোষ এবং আক্রান্ত পরিবারের আইনজীবী। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে জানিয়ে দেওয়া হয় তরুণীর ধর্ষণের প্রমাণ লোপাট করার যে প্রচেষ্টা পুলিশ প্রশাসন করছে তার পরিণাম ভালো হবে না। ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত বাচ্চু ঘোষ ও রথীন পাল গ্রেপ্তার হয়। পরদিন ১৯ জুলাই মূল অভিযুক্ত বাচ্চু ঘোষকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলার সময়ও পার্টি কর্মীরা সেখানে বিক্ষোভ দেখায়।

যেভাবে সমগ্র ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। এলাকার নাগরিকদের সংগঠিত করে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

বাজেট ও ইজরায়েলী হামলার বিরুদ্ধে সভা

১৬ জুলাই (বুধবার) জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা মোড়ে সি পি আই (এম এল) জেলা কমিটির উদ্যোগে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের রেল ও সাধারণ বাজেটে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার প্রতিবাদ করে বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সুভাষ দত্ত, জেলা কমিটি সদস্য বিজন সরকার ও পার্টি নেতা প্রদীপ গোস্বামী।

সভাতে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলের বর্বর গণহত্যা এবং ভারত সরকারের নীরব ভূমিকার বিরোধিতা করা হয়।

২৮ জুলাই শহীদ দিবস

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তেভাগার স্মৃতি রেখে চলে গেলেন কমরেড বিশ্বরঞ্জন দাস

গত ১৬ জুলাই রাত ১২টায় বালুরঘাট সদর হাসপাতালে দক্ষিণ দিনাজপুরের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তথা সংগ্রামী প্রবীণ নেতা কমরেড বিশ্বরঞ্জন দাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। আমৃত্যু পার্টি সদস্য বিশাদা তাঁর পরিবারে রেখে গেলেন স্ত্রী, চার কন্যা ও ছয় পুত্রকে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বিশাদা বামপন্থী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বাবা কৃষ্ণদাস মহান্ত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দিনাজপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাবা ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে কালী সরকার, গোষ্ঠ বিহারী সরকার ও তাঁর নিজের বড়দা ননীগোপাল দাসের সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন। সর্বোপরি কংসারী হালদার এবং আবদুল্লা রসুলের অনুপ্রেরণায় তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঝাঁপ দেন তৎকালীন তেভাগা আন্দোলন পর্বে। তখন তিনি যুবক। পরবর্তীতে তেভাগার সৈনিক সংশাপত্র পেয়েছিলেন।

কালক্রমে ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার পর তিনি সি পি আই (এম)-এ যোগ দেন। তখন একবার জমি আন্দোলনে গ্রেপ্তার হলে হাজার হাজার মানুষ থানা ঘেরাও করে তাঁকে ছাড়িয়ে আনার জন্য জমায়েত হয় স্বতস্ফূর্তভাবে। তিনি সারা জীবনে এরকম কারাবরণ করেন বহুবার। কিন্তু প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও সরকারি পেনশন গ্রহণ করেননি নীতিগত কারণে।

১৯৭৪ সালে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিতর্কে সি পি আই (এম) দল ছাড়েন। ১৯৭৮ সালে কানু স্যানাল নেতৃত্বাধীন ও সি সি আর সংগঠনে যোগ দেন। ১৯৯৪ সাল থেকে কমরেড অজিত দাসের সঙ্গে একসাথে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনে যোগদান করেন এবং অবিচল ছিলেন আমৃত্যু।

শেষ অবস্থায় শয্যাশায়ী ও অসুস্থ ছিলেন কয়েক বছর। কিন্তু তখনও বহু মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করতে আসতেন। তাঁকে অন্তিম বিদায় জানাতে জেলা পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীরা ১৭ জুলাই হাসপাতালে যান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটি সদস্য তসলিম ও জেলা সম্পাদক দীনেশ সরকার। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন ঐতিহ্যময় বিশিষ্ট বামপন্থী নেতাকে হারালো। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংগ্রামের প্রেরণা হয়ে তিনি আছেন, থাকবেন। কমরেড বিশ্বরঞ্জন দাস অমর রহে।

- নবকুমার বিশ্বাস

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সি পি আই (এম এল) লিবারেশানের বি বা দী বাগ কমিটির অধীন সি জি এইচ এস পার্টি ব্রাঞ্চের সদস্য কমরেড অলোক বোস গত ১৮ জুলাই রাত ১১.১৫ নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। নিঃসন্তান কমরেড অলোক বোস রেখে গেছেন স্ত্রী সহ পার্টির সাথী ও পারিবারিক শুভানুধ্যায়ীদের। তিনি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হেলথ্ স্কীমে চাকুরীজীবী ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও সি জি এইচ এস-এ চাকুরীরত, পার্টি সদস্য এবং নেতৃস্থানীয় কমরেড।

কমরেড অলোক বোস ১৯৮০-র দশক থেকে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সাল থেকে সি পি আই (এম এল)-এর সংস্পর্শে আসেন। তিনি অল ইন্ডিয়া সি জি এইচ এস এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের কলকাতা চ্যাপ্টারের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করে গেছেন। পার্টির বহু কর্মসূচীতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু পার্টির সদস্য হিসেবে ছিলেন। বিগত দু-তিন বছর যাবত তিনি অসুস্থ ছিলেন।

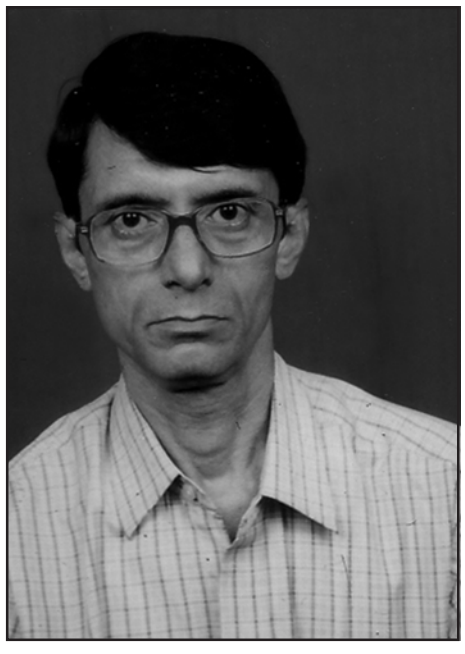

কমরেড অলোক বোসের অকাল প্রয়াণে সি পি আই (এম এল) কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গভীর শোকপ্রকাশ করা হয় এবং তাঁর স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হয়।

গাজায় ইজরায়েলী হামলার বিরুদ্ধে বেহালায় বিক্ষোভ মিছিল

প্যালেস্তাইনের গাজায় ইজরায়েলের ক্রমাগত যুদ্ধবাজ বোমারু বিমান হানায় ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হয়ে চলার বিরুদ্ধে এবং এই কারণে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভারতের মোদী সরকার কোনরকম পদক্ষেপ না করার প্রতিবাদে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কলকাতা জেলা কমিটির অন্তর্গত বেহালা পূর্ব লোকাল কমিটির উদ্যোগে চৌরাস্তা থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পঞ্চাননতলা, মদনতলা, নেতাজী সড়ক হয়ে সিরিটি মুচিপাড়া অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়। গাজায় অবিলম্বে বোমা বর্ষণ বন্ধ করার দাবি তোলার প্রশ্নে মোদী সরকার মৌনব্রত অবলম্বন করার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। মিছিলে একইসঙ্গে আওয়াজ ওঠে জনবিরোধী রেল বাজেট ও কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে। ভারতীয় রেলকে বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া, মাশুল ও যাত্রী ভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান বাম নেত্রী বিদ্যা মুন্সী

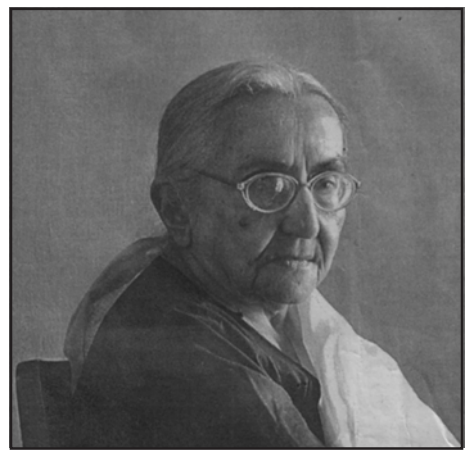

প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান বামপন্থী নেত্রী বিদ্যা মুন্সী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

গত শতাব্দীতে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রাম ও অন্যান্য গণ সংগ্রামগুলোর পরিপূরক হিসেবে সমান্তরাল ধারায় গড়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী নারী আন্দোলন—তার একেবারে প্রথম সারিতে ছিলেন রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, ছবি বসু, নিবেদিতা নাগ এবং অবশ্যই বিদ্যা মুন্সী প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। এই বিদ্যা মুন্সীই প্রয়াত হলেন গত ৭ জুলাই ২০১৪। এক অর্থে বলা যায় যে তাঁর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে অবসান ঘটল একটি বিশেষ ধারার ও পরম্পরার।

জন্মসূত্রে গুজরাটি পরিবারভুক্ত বিদ্যা কানুগা ১৮ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার পর ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য। রক্ষণশীল পরিবারের দিক থেকে অনেক বাধা এলেও বিদ্যা কানুগার মাতামহীর বক্তব্য ছিল যে কন্যার পিতার যখন আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে এবং কন্যাটি যথেষ্ট পরিমাণে সাহসী—তখন এতে আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না।

সাহসী তো বটেই, ডাক্তারী পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে গেলেও সেখানে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন—গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ও তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে একই যোগসূত্রে আবদ্ধ হলেন। ভারতবর্ষে তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু তিনি আর কোনদিনই পেছনে ফিরে তাকাননি।

তিন খণ্ডে রচিত ''ইন রেট্রোস্পেক্টিভ ওয়ার টাইম মেমোরিজ এ্যাণ্ড থটস্'' গ্রন্থে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসার বিবরণ—বিভিন্ন ধরনের গণ আন্দোলন—আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণের কথা। তৃতীয় খণ্ডে দেশে ফেরার পর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও ঘটনাবলীর বিশদ বিশ্লেষণ। স্বাধীনতার পরবর্তী কালেও বিভিন্ন দেশের সম্মেলনে ভারতীয় নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। একদিকে নারী আন্দোলনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিতর্ক ও সমস্যাসমূহ নিয়ে আলাপ আলোচনায় অংশ নেওয়া অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিয়েতনাম, কিউবা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সংহতিমূলক সংগ্রামে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৫২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি মুম্বাইয়ের সাপ্তাহিক ব্লিৎস পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। বলা যায়, এক অর্থে কলকাতায় তিনিই প্রথম মহিলা সাংবাদিক। অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন লেখাতে তাঁর জুড়ি ছিল না বললেই চলে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল আসানসোলের চিনাকুরি মাইন দুর্ঘটনা নিয়ে তাঁর রচিত প্রতিবেদন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই উৎপল দত্ত পরবর্তীকালে অঙ্গার নাটকের চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন।

বিলেত থেকে দেশে ফেরার পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র আন্দোলনের মুখপত্র 'দি স্টুডেন্ট'-এর সম্পাদক সুনীল মুন্সীর সাথে। পরবর্তীকালে যিনি ভূগোলবিদ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। সুনীল মুন্সীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাতেই তিনি মহিলাদের মুখপত্র 'চলার পথে'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পরেই তিনি সি পি আই-এর জাতীয় পরিষদের সদস্য হন। পার্টির মধ্যেও নারী আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে পার্টির ভূমিকার ওপর নজরদারী রাখতেন।

১৯৮০-র দশক থেকে যে নতুন নারীবাদী আন্দোলনের বিকাশ শুরু হয়েছিল সে ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যা মুন্সী ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই সঙ্গে একটি সাধারণ মঞ্চের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নারী গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি চাইতেন নারী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে, এমনকি পার্টির মধ্যেও। সমাজতন্ত্র নামক ব্যবস্থায় স্বতস্ফূর্তভাবে মহিলাদের মুক্তি ঘটে যাবে এমন সহজ সমীকরণে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর কাছ থেকে জানা যায় যে কোনো একটি পার্টি সম্মেলনে নেতৃত্ব আক্ষেপ করেছিলেন যে অল্প বয়সী মেয়েরা আর আগের মত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। এর জবাবে বিদ্যা মুন্সী বলেছিলেন যে, এ বিষয়ে পার্টি নেতৃত্ব তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটালে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মহিলারাও পার্টি সদস্যপদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধ '*পরিবারের গণতান্ত্রিকীকরণ*' একইসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত নিয়েই সামগ্রিক বিদ্যা মুন্সীর পরিচয়। ২০০২ সাল নাগাদ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে দেহের দক্ষিণ দিক অচল হয়ে পড়লেও মানসিকভাবে ছিলেন পরিপূর্ণ সজাগ। টেবিল চেয়ারে বসে নিয়মিত অধ্যয়ন ও লেখালেখির কাজে রত থাকতে দেখা গেছে অনেকদিন পর্যন্ত। তাঁর স্মৃতি অবিনশ্বর হোক।

- অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহালায় নতুন বাসরুট আদায়

গত ১৭ জুলাই সি পি আই (এম এল) কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃত্বে তিনজনের এক প্রতিনিধিদল রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সেক্রেটারি শ্রী অচিন্ত কুমার মণ্ডলের সাথে দেখা করে পূর্ব বেহলার নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের যাতায়াতের সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানের লক্ষ্যে ঐ এলাকার দুটি রুটে অবিলম্বে বাস চালু করার নির্দিষ্ট দাবি রাখেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার প্রেক্ষিতে সেক্রেটারি অচিন্তবাবু এই দুটি রুটের মাস চালুর যৌক্তিকতা মেনে নেন এবং এই দুটি রুটে বাস চালানোর জন্য গভর্ণমেন্ট নোটিফিকেশন জারি করার নির্দেশে দেন।

ঐ অঞ্চলের মানুষ নিয়ে সি পি আই (এম এল)-এর ধারাবাহিক প্রচার ও আন্দোলনের প্রয়াসই এই প্রাথমিক সাফল্য নিয়ে এসেছে, যা আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দ্বন্দ্ব ঃ ইতিহাসের দিকে চোখ রেখে

প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলের হামলা অব্যাহত। সারা বিশ্বের বিবেকী কণ্ঠস্বর প্রতিবাদ করছেন, বিচলিত হচ্ছেন রক্তপাতের নৃশংস ধারাবাহিকতায়। সেই প্রতিবাদ ও উৎকণ্ঠার শরিক হিসেবেই ফিরে দেখা দরকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের এক দীর্ঘ ইতিহাসকে।

১৯৪৮-এ ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকেই প্যালেস্তাইন তথা আরব দুনিয়ার সাথে (মার্কিন ও ন্যাটোর মদতে) বারবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়েছে। অথচ বিশ শতকের প্রথম দিকেও প্যালেস্তিনীয় ও ইহুদী ও জাতিসত্তার আন্দোলনের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। ১৯২০-র ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধে সিরিয়ার পরাজয়ের পর এই শান্তি ক্রমশ বিঘ্নিত হতে শুরু করে। প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার আন্দোলনের এই পর্বের অন্যতম রূপকার হজ আমিন আল হুসেইনি প্যালেস্তিনীয় আরবদের নিজস্ব দেশের দাবিকে সামনে নিয়ে আসেন। এই সময়েই ইউরোপে ফ্যাসিস্তদের ইহুদী বিতাড়ন ও নিপীড়নের অধ্যায় শুরু হলে তারা প্যালেস্তাইনে চলে আসতে থাকেন। প্যালেস্তাইনে বাড়তে থাকা ইজরায়েলি জনসংখ্যার চাপের প্রেক্ষিতে আরব প্যালেস্তিনীয়দের নিজেদের দেশের দাবি সঙ্কটজনক হয়ে উঠছে বিবেচনা করে আমিন হুসেইনি ইহুদী জাতিসত্তার আন্দোলনকে আরব প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার আন্দোলনের প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেন। বিভিন্ন আরব দেশে আরব প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন তৈরি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই প্যালেস্তিনীয় ইহুদী ও প্যালেস্তিনীয় আরবদের মধ্যে বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই ইউরোপের নানা দেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জেনারেল অ্যাসেম্বলী প্যালেস্তাইনকে তিনভাগ করার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যার একটি হবে আরব রাষ্ট্র, একটি ইহুদী রাষ্ট্র ও আলাদা অঞ্চল হিসেবে থাকবে জেরুজালেম, যে ঐতিহাসিক শহর ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলিম—এই তিন ধর্মেরই অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান। এই ঘোষণার পরদিন থেকেই আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪৮-এর বসন্তের মধ্যে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যায় ইহুদীরা সামরিকভাবে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠে অনেক ভূখণ্ড নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে, জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় আরব জনতাকে। অন্যদিকে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে প্যালেস্তিনীয় আরবদের প্রতি ব্যাপক সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব অঞ্চলের ইহুদিদের উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসতে হয় প্যালেস্তাইনের দিকে। ১৪ মে ১৯৪৮ ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরেই আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে নবগঠিত ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হয় । ১৫০০০ মানুষ হতাহত হওয়ার পর ১৯৪৯-এ যুদ্ধবিরতি হয়। ইজরায়েল তার ভূখণ্ডের বেশিরভাগ জায়গাই নিজেদের দখলে রাখে, ওয়েস্টব্যাঙ্ক যায় জর্ডনের অধিকারে, গাজা স্ট্রিপের দখল থাকে মিশরের হাতে। পরে এই দুই ভূখণ্ড মিলিয়ে 'সমগ্র প্যালেস্তাইন সরকার'-কে স্বীকৃতি দেয় আরব লীগ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই গাজা স্ট্রিপ ও ওয়েস্টব্যাঙ্ক বর্তমানে আরব প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার আন্দোলনকারীদের দখলে আছে, আর জাতিসংঘ তথা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ না মানলেও ইজরায়েল এ দুটিকে তাদের দেশের অন্তর্গত বলে দাবি করে চলেছে। ১৯৫৬-তে 'সুয়েজ সঙ্কট'-এর সময় কিছুদিনের জন্য ইজরায়েল গাজা স্ট্রিপ দখল করলেও তাদের সেখান থেকে অচিরেই বিতাড়িত হতে হয়। এরপরেই আরব জাতিসত্তার আন্দোলন একটা বড় ধাক্কার মুখে পড়ে। মিশর আরব দেশগুলোর প্রধান নেতা হিসেবে 'সমগ্র প্যালেস্তাইন সরকার'-কে ভেঙে দিয়ে তাকে 'সংযুক্ত আরব রিপাবলিক'-এর অংশ করে নেয় ১৯৫৯ সালে। এর প্রতিক্রিয়াতেই ১৯৬৪-তে প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু হয় ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে 'প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গনাইজেশন' বা পি এল ও গঠনের মধ্য দিয়ে। আরব লীগের বিভিন্ন দেশে পি এল ও-কে সমর্থনও করে। ১৯৬৭-র 'ছয় দিনের যুদ্ধ' পি এল ও তথা আরব প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার আন্দোলনের ওপর এক বড় আঘাত হিসেবে আসে, যার মধ্যে দিয়ে ইজরায়েল ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা স্ট্রিপ দখল করে নেয়। পি এল ও তার সদর দপ্তরকে বাধ্য হয়ে সরিয়ে নেয় জর্ডনে। ১৯৭০-এ জর্ডন-প্যালেস্তাইন বিতর্ক ও গৃহযুদ্ধের পর পি এল ও-র সদর দপ্তর আবার সরে আসে দক্ষিণ লেবাননে। আশির দশকে লেবাননে গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে আরাফতের সিদ্ধান্তে পি এল ও-র সদর দপ্তর আবার সরে আসে টিউনিশিয়াতে। এই সময় আন্তর্জাতিক দুনিয়া ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘর্ষ বিরতিতে হস্তক্ষেপ করে, যার ফলে ১৯৯৩-তে খানিকটা শান্তিপ্রক্রিয়া 'ওসলো চুক্তি'-র মাধ্যমে সংগঠিত হয়। পি এল ও টিউনিশিয়া থেকে ফিরে আসে গাজা স্ট্রিপ ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্যালেস্তিনীয়ান ন্যাশানাল অথরিটি'। প্যালেস্তিনীয়দের কোনও কোনও অংশ এই শান্তিচুক্তি মানতে পারেনি, তারা প্যালেস্তিনীয় সরকারের নীতির সমালোচনা শুরু করে, চালাতে থাকে ইজরায়েলের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে হামাস। গাজা স্ট্রিপে তারাই প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। ২০০০ সাল থেকে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দ্বন্দ্ব ক্ষণিক বিরতির পর আবার নতুন করে পেকে ওঠে। প্যালেস্তাইনের অভ্যন্তরেও পি এল ও-র প্রধান অংশ ফতেয়া ও হামাস-এর অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ শুরু হয়, তা ২০০৭ সালে গাজা যুদ্ধের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। ছোটখাটো বিতর্ক-সংঘর্ষ সত্ত্বেও ২০০৯-এ তাদের মধ্যে একটি শান্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২০১১-তে প্যালেস্তাইন অথরিটি জাতিসংঘে (ইউনাইটেড নেশনস) সদস্যপদের আবেদন ইজরায়েল ও তার মিত্র দেশগুলোর প্রবল বিরোধিতায় বাতিল হয়। এই ঘটনা নতুন সংঘর্ষের জন্ম দেয়। হামাস নেতৃত্বাধীন গাজা স্ট্রীপ থেকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে রকেট হানা চলতে থাকে। ২০১২-তে ইজরায়েলের আগ্রাসী আক্রমণে শুরু হওয়া যুদ্ধকে সে এরই প্রতিক্রিয়া বলে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। ২০১৪ সালের জুনে আবার ইজরায়েল সামনে এনেছে তাদের কয়েকজন নাগরিকের অপহৃত হওয়ার প্রসঙ্গ এবং তাকেই ব্যবহার করে নারকীয় হত্যালীলা চালাচ্ছে। যার বলি মূলত অসামরিক মানুষজন, নারী ও শিশুরা।

এটা স্পষ্ট আরব প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার পূর্ণ মর্যাদা ছাড়া এই চলমান যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের কোনও স্থায়ী সমাধান থাকতে পারে না। ইজরায়ে মার্কিন ন্যাটো অক্ষ কিছুতেই স্বাধীন ভূখণ্ড ও জাতিসংঘে সদস্যপদ সহ আরব প্যালেস্তিনীয়দের দীর্ঘকালীন ন্যায্য দাবিকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এই প্রত্যাখ্যানই নানা জঙ্গী আক্রমণের দিকে প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তার আন্দোলনকে ঠেলে দেয় ও তাকে অজুহাত করে ইজরায়েল ন্যাটো-মার্কিন অক্ষের সমর্থনে পাল্টা হামলা চালায়। বস্তুতপক্ষে ইজরায়েলের মধ্য দিয়ে আরব দুনিয়ায় মার্কিন অক্ষ নিজেদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কৌশল হিসেবেই ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘর্ষকে জিইয়ে রেখেছে।

- সৌভিক ঘোষাল

প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগ্রাম

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই উপমহাদেশে পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল। ঐ বছরই প্যালস্তাইনকে বিভাজিত করার প্ল্যান পাশ হয় জাতিসংঘে। প্যালেস্তাইনকে কেটে ইহুদিদের জন্য ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় নব্যরূপে উপনিবেশ গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর বলা যেতে পারে এই সিদ্ধান্তকে। পরের বছর থেকেই শুরু হয়ে যায় এথনিক ক্লিন্সিং অর্থাৎ প্যালেস্তাইনে আরব জনগোষ্ঠী নির্মূলীকরণের কাজ। এখন ইজরায়েল গাজায় মারাত্মক টাইম বোমা—ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম যুক্ত বোমা ফেলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে 'গণতন্ত্র' উপহার দিতে এই বোমা ফেলেছিল। এই বোমাগুলো ক্যান্সার রোগ ছড়ায়। জায়নবাদ আরেক ক্যান্সার।

ইহুদি জাতিয়তাবাদকে বলে জায়নবাদ। সব হিন্দু যেমন হিন্দুত্ববাদী নয় তেমনি সব জিউ জায়নবাদী নয়। জায়নবাদ প্রকৃত অর্থে নিকৃষ্ট রূপের জাতিয়তাবাদ। ঈশ্বরের সাথে ইহুদিদের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি মোতাবেক প্যালেস্তাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম করতেই হবে, অন্য কোন ইহজাগতিক বা আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক যুক্তি চলবে না, চলবে না অন্য কোন ঈশ্বরের কথা—এমনটাই দাবি জায়নবাদীদের। আরব ভূখণ্ডের জ্বালানি ভাণ্ডার, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নয়া ঔপনিবেশিক আধিপত্য কায়েমের মার্কিন হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই জায়নবাদ। ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন ও আন্তর্জাতিক মহলে তার স্বীকৃতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে এনে দেয় ঈশ্বরের সাথে হওয়া চুক্তি কার্যকর করার পবিত্র ক্ষমতা। হোয়াইট হাউসে এবারের ইফতার পার্টিতে তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মুসলিম নেতাদের সাথে সাথে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতকেও যিনি ঐ ইফতর পার্টিতে তার বক্তব্যে আরব দুনিয়া তথা মুসলিমদের 'যুদ্ধবাজ প্রকৃতি' ব্যাখ্যা করেন ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তার দেশের সরকার ঈশ্বরের সাথে হওয়া চুক্তি কার্যকর করতে অর্ধশতক যাবত কয়েদ করে রাখা গাজাবাসীদের ওপর বিমান হামলা চালাচ্ছিল। ইরাকে মার্কিনী 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এখন সেখানেও নিজ নিজ ঈশ্বরের সাথে হওয়া চুক্তি হাসিল করার উন্মুক্ত রণক্ষেত্র প্রস্তুত।

ইউরোপীয়রা পৃথিবীর বহু দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও অধিবাসীদের ধ্বংস করে নিজেদের বসতি বানিয়েছিল। তারা নিজেদের সভ্য আর দখলীকৃত জনগোষ্ঠীকে অসভ্য আখ্যা দিয়ে ধ্বংস ও লুণ্ঠনকে সুসভ্যকরণ কর্মসূচী হিসাবে মতাদর্শগত বৈধতা দিয়েছিল। ইউরোপীয়দের এই জাতিবিদ্বেষী মতাদর্শ তাদের নিজেদের অভ্যন্তরে প্রকাশ পায় ইহুদি বিরোধী ঘৃণ্য চর্চায়। পরিণতিতে ইউরোপে ইহুদি নিধন যজ্ঞ চলে যাকে বলা হয় হলকস্ট্ ইউরোপ মহাদেশে ফ্যাসিস্ট রাজত্বে চলা এই ইহুদি নিধন যজ্ঞের সকরুণ কাহিনী যুদ্ধোত্তর পর্বে সহস্র তরিকায় ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদ। সেই হলকস্ট্-এর হিস্টরিক্যাল জাস্টিস সাধনের জন্যই যেন হাজার হাজার আরব জনতাকে ছিন্নভিন্ন ও পদানত করে প্যালেস্তাইনের বুক ছিঁড়ে স্থাপন করা হচ্ছে ইজরায়েল রাষ্ট্র। যেন দুনিয়া জুড়ে এমন অসংখ্য হলকস্ট্ সংগঠিত করেনি সাম্রাজ্যবাদ! যেন উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আদি অধিবাসী জনগোষ্ঠী সংহারের রক্তাক্ত কাহিনী বিস্মৃত হয়েছে ইতিহাস!

'৬৭ সালে ৬ দিনের অতর্কিত আক্রমণে প্যালেস্তাইন দখল করে ইজরায়েল। এর মাত্র তিন বছর আগে গঠিত হয়েছিল প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গনাইজেশন বা পি এল ও, যা ছিল প্যালেস্তাইনের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে এক ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক মোর্চা, যাকে দুনিয়ার একশটি দেশ প্যালেস্তিনীয় মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের ঘোষণায় পি এল ও বর্ণিত হয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে (১৯৯১ সালের মাদ্রিদ কনফারেন্সের আগে পর্যন্ত যা বলবৎ রেখেছিল তারা)। উল্টোদিকে, প্যালেস্তাইন দখলের পর থেকেই পি এল ও-র মূল দল ফাতাহ-র বিরুদ্ধে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে তোল্লাই দিতে শুরু করে ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ। একটা করে দিন অতিবাহিত হয় আর বাড়তে থাকে নতুন নতুন ইজরায়েলি সেটেলমেন্ট স্থাপনের কাজ। এক একটা দিন যায় আর ক্রমাগত ক্ষীণ হতে থাকে প্যালেস্তাইনের মুক্তির স্বপ্ন। এই অবস্থায় ১৯৮৭ সালে এসে চরমপন্থী হিসাবে হামাস-এর জন্ম হয়। ২০০৬ সালে হামাস সুর নরম করে নির্বাচন লড়ে ও ফাতাহকে পরাস্ত করে ১৩২টির মধ্যে ৭৬টি এসেম্বলি আসনে জিতে সরকারে আসে। কিন্তু ইজরায়েল এই সরকারকে মানতে অস্বীকার করে। ততদিনে হামাসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রতি বছর ইজরায়েল হামাসের হামলার কথা বলে বিমান হানা চালায়, তারপর সেটেলমেন্ট বাড়ায়, তারপর আবার কিছুদিন শ্মশানের শান্তি।

গাজা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা। মার খেয়ে পেছোতে পেছোতে সবাই জমেছে এসে এইখানে, যাকে বলা যায় দুনিয়ার সর্ববৃহৎ জেলখানা। সেখানে ইজরায়েলের অনুমতি ছাড়া কাকপক্ষীরও প্রবেশ নিষেধ। ইজরায়েলী সেনা ও নৌবাহিনী তিনদিক থেকে সম্পূর্ণ ঘিরে অবরুদ্ধ করে রেখেছে গাজাকে। বাকী এক দিক মিশর দেশের সাথে সীমান্ত। এই সীমান্ত বরাবর মিশরের সেনা মোতায়েন আছে ইজরায়েল ও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে, তারাই সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সীমানা পারাপার। গাজাই নেই কোন সমুদ্র বন্দর, নেই বিমান বন্দর বা এমনকি রেল স্টেশন। গাজার অধিবাসীরা বাইরে কোথাও যেতে পারে না। তাদের কোন পাসপোর্ট নেই। গাজার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতেও বসানো আছে ইজরায়েলী সেনার চেকপোস্ট। যাতায়াতের পথে ঐ সেনাদের দ্বারা লাঞ্ছনা-হয়রানি প্যালেস্তিনীয়দের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হাসপাতালে নেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। মাঝে মাঝেই ইজরায়েলী বোমারু বিমান বোমা ফেলে যায়। গাজাবাসী আহত হয়। চেকপয়েন্টগুলোতে তারা কাকুতি মিনতি করে বাইরে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার। কিন্তু 'দয়ালু' সেনার অনুমতি মেলে না। অনেক ক্ষেত্রেই আহতেরা চিকিৎসার অভাবে বাকী জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

১৯৮৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর পি এল ও-র নেতৃত্বে আলজিরিয়ায় প্যালেস্তাইনের প্রবাসী সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ভারত ছিল আরব দেশগুলোর বাইরে প্রথম দেশ যে নিজস্ব ঘোষণার

আটের পাতায় দেখুন

রেল শ্রমিক ও যাত্রী সাধারণের চোখে মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেট ২০১৪-১৫

মোদী সরকারের প্রথম রেল বাজেট এবং সম্ভবত এটাই শেষ বাজেট। আর পরবর্তী বছরে দু-একটা বাজেট যদি হয়ও সেই বাজেটে সাধারণ কোষাগার থেকে বাজেট সহায়তা চিরতরে বন্ধ হবে। কারণ ভারতীয় রেলের কর্পোরেটকরণ সম্পূর্ণ হলে আর বিভাগীয় বাজেটের প্রয়োজন হবে না। যেমন ইতিমধ্যে স্বশাসিত কঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশন, দিল্লী মেট্রো কর্পোরেশন এবং কনটেনার কর্পোরেশন, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড ইত্যাদির মতো ভারতীয় রেলের অধীনে আরও ১৪টা স্বশাসিত সংস্থা আছে। এর সাথে যুক্ত হবে বুলেট ট্রেন কর্পোরেশন, ডেডিকেটেড ফ্রেট কর্পোরেশন, হাইস্পিড ট্রেন নেটওয়ার্ক কর্পোরেশন। কলকাতা মেট্রো সহ সব মেট্রো রেলওয়ে পিপিপি মডেলে চলবে। আর বাকি রইল জোনাল রেলওয়ে এবং সেগুলো সুযোগমত দেশী ও বিদেশী মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হবে। রেল শ্রমিকের ঘামে-রক্তে এবং জনগণের টাকায় তিলে তিলে গড়ে ওঠা জাতীয় সম্পদ এইভাবে লুঠ হয়ে যাবে।

বাজেটে না বলা কথা ও কাহিনী

রেল বাজেটের অর্থ শুধু আয়ব্যয়ের হিসেব নয়—কিছু শব্দের ফুলঝুরি আর সংখ্যার ভোজবাজি। এবারের বাজেটে বলা হয়েছে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা'র জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা প্রতিবছর খরচ করা হয়। কিন্তু বলা হয়নি ভর্তুকি কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। শুধুই কি যাত্রীভাড়াতে ভর্তুকি? ইস্পাত পরিবহণে টাটা গোষ্ঠী কি দীর্ঘদিন ভর্তুকি পেয়ে আসছে না? কোটি কোটি টাকা ব্যবসায়ীদের ডিমারেজ অর্থাৎ ওয়াগান নির্দিষ্ট সময়ে খালাস না করলে বিলম্ব শুল্ক মকুব করা হয়। এটাও ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের মতো। সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি পরিবহণে ভর্তুকি দেওয়া হয় না? সি এ জি রিপোর্টে প্রমাণিত যে, আকরিক লোহার রপ্তানিকারকরা ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল অবধি প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করেছিল। দেশীয় শিল্পের জন্য ব্যবহৃত আকরিক লোহা পরিবহণে পণ্যমাশুলে ছাড় ছিল। মিথ্যে ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে রপ্তানিকারকরা সেই সুবিধে পেয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ একটি রপ্তানিকারক কোম্পানি ঝাড়গ্রামে আকরিক লোহা ওয়াগন থেকে খালাস করে সড়ক পরিবহণের মাধ্যমে হলদিয়া বন্দর থেকে বিদেশে রপ্তানি করেছিল। উক্ত কৌশলে রেল আমলাদের যোগসাজশে বিশাল ভর্তুকির টাকা আত্মসাৎ করেছিল। এইসব চুরি বন্ধ করলে প্যাসেঞ্জারকে ভর্তুকি দিতে সমস্যা হবে না। শুধু দেখানো হয়েছে ২০১২-১৩-তে প্যাসেঞ্জার পিছু ২৩ পয়সা ক্ষতি হয়েছে। এটা ব্যবসায়িক ক্ষতি না সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়? এবারের বাজেটে লভ্যাংশ অর্থাৎ ডিভিডেন্ট হিসেবে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে ৯১৩৫ কোটি টাকা। পাশাপাশি বাজার থেকে ঋণ নেওয়া হবে ১১৭৯০ কোটি টাকা। তাই স্বাভাবিক প্রশ্ন অর্থের যখন এতই টানাটানি কেনই বা সরকারকে ডিভিডেন্ট দেওয়া হবে? উদ্বৃত্ত অর্থ রেলের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা উচিত। বর্তমান বাজেটে অপারেটিং রেশিও ৯২.৫ শতাংশ দেখানো হয়েছে অর্থাৎ ১ টাকা আয় করতে রেলে ৯২ টাকা ৫০ পয়সা খরচ হয়। ২০১৪-১৫-তে আয় ১,৬৪,৩৭৫ কোটি টাকা আর ব্যয় ১,৪৯,১৭৬ কোটি টাকা।

এই বাজেট খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। মর্মবস্তুতে ভারতীয় রেলকে টুকরো টুকরো করে লাভজনক সম্পত্তিকে ক্রমশ দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের হস্তান্তর করা হবে। সমান্তরাল দুটো রেল ব্যবস্থা চালু হবে। একটি নেটওয়ার্কে শুধু বুলেট ও দ্রুতগামী ট্রেন (১৬০-২০০ কি.মি) চলবে আর পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা যা লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে বিদেশী পুঁজির দখলে থাকবে। উক্ত প্রক্রিয়াতে মোদী সরকার উদার হস্তে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি থাকবে শ্রমজীবী-মধ্যবিত্ত-গরিব মানুষের জন্য একটি নেটওয়ার্ক। এদের রেলপথে ট্রেন অনিয়মিত চলবে। পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যাবে না। গবাদি পশুর মত ট্রেনের কামরায় গাদাগাদি করে চড়তে হবে। যাত্রার স্বাচ্ছন্দের ছিটেফোঁটাও থাকবে না। বিকল ফ্যান, আলো ছাড়াই ট্রেন চলবে। দুর্বল ট্র্যাক আর ভাঙ্গা ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেন চলবে। নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না। যেখানে ট্রেন ছাড়া গতি নেই সেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলতে হবে। কামরাগুলো ঝরঝরে। কর্মীর অভাবে ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত হয় না। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের সহায়তা না পেলে ৬০ শতাংশ মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া কামরা, ইঞ্জিন বা ট্র্যাক কোনটাই প্রতিস্থাপিত করা হবে না। এই বাজেটে যা সংস্থান আছে ৩০,১০০ কোটি টাকা, তা উন্নয়নের খাতেই খরচা হয়ে যাবে।

একে নিরাপত্তাহীন যাত্রা। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া—এই বাজেটে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তেলের দাম বাড়লেই এবার থেকে বাড়বে যাত্রীভাড়া। ছমাস অন্তর তেলের দাম খতিয়ে দেখে ভাড়া বাড়াবে রেল।

ভারতীয় রেলে ৯০ শতাংশ যাত্রী সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাতায়াত করেন। বড় শহরের টার্মিনাল স্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ার আগে দেখা যায় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষামান সাধারণ যাত্রীরা। এঁরা কারা? এরা পরিযায়ী শ্রমিক—চেন্নাই, মুম্বাই, গুজরাট বা দিল্লীতে যাচ্ছেন নিজের কাজের জায়গায় বা কাজের খোঁজে। এক্সপ্রেস ট্রেনে ২/৩টি অসংরক্ষিত কামরা থাকার ফলে পোহাতে হয় দুর্ভোগ। এখন সবচেয়ে লম্বা ট্রেন চলে ২৫ কোচের। আরও ৫টা কামরা যুক্ত করলে ৩০ কোচের ট্রেন অনায়াসে চলতে পারে। এতে আরও ৪০০ যাত্রীর সংকুলান হবে। মোদী সরকারের সদিচ্ছা নেই। কারণ এটা করতে গেলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ বাড়াতে হবে, বাড়তি কোচ তৈরি করতে হবে ও কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে। বাজেটে তার কোন উচ্চবাচ্য নেই। আর সংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণীতেও সারা বছরই ৩০০/৪০০ জন প্যাসেঞ্জার থাকে ওয়েটিংলিস্টেড।

ক্যাটারিং পরিষেবা প্রসঙ্গে

ক্যাটারিং পরিষেবা বেসরকারিকরণের পূর্বাবস্থায় আর যাই হোক পচা খাবার পরিবেশনের খবর শিরোনামে কোন দিনই আসেনি। তখন বিভাগীয় পরিষেবা ব্যবস্থায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশিত হত। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ রেলে উদারনৈতিক অর্থনীতির জমানায় ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং এণ্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। শুরুতে ক্যাটারিং মজদুরদের সংগঠিত প্রতিরোধের ফলে আই আর সি টি সি ক্যাটারিং বিভাগ অধিগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ২০০২/২০০৩ সালে ইউনিয়নের সাথে চুক্তির ফলে বিভাগীয় ক্যাটারিং পরিষেবা আই আর সি টি সি-র অধীনে চলে যায়। খুব কম সংখ্যক শ্রমিক আই আর সি টি সি-তে যোগদান করে। বাকি শ্রমিক অন্যান্য বিভাগে পুনর্নিয়োজিত হয়। তখন থেকে শুরু হয় ক্যাটরিং পরিষেবার অবনতি। কারণ আই আর সি টি সি সমস্ত কাজ আউটসোর্সিং করে দেয়। ২০১০ সালে রেল প্রশাসন সমস্ত মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের প্যান্ট্রিকারগুলো অধিগ্রহণ করে কন্ট্রাক্টে দিয়ে দেয়। কন্ট্রাক্টররা মুনাফার জন্য নিম্নমানের ও নির্দিষ্ট রেসিপির চেয়ে কম পরিমাণের খাবার সরবরাহ করতে থাকে। আই আর সি টি সি দুরন্ত, শতাব্দী, প্রিমিয়াম ট্রেন, রাজধানী এক্সপ্রেস ও ফুড প্লাজা নিজের ম্যানেজমেন্টে রাখে এবং বেশীরভাগটাই আউটসোর্সিং করে দেয়। কারণ ম্যানেজার ও অফিস স্টাফ ছাড়া আই আর সি টি সি-র নিজস্ব কোন দক্ষ কর্মীবাহিনী নেই। এই বাজেট পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন না করে দামী ব্রাণ্ডের খাবারের সরবরাহের ঘোষণা করেছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল যাত্রীদের কে এফ সি বা ম্যাকডোনাল্ডের খাবারের জন্য ব্যয় করতে অসুবিধে হবে না। আর বাস্তবিকপক্ষে 'ভারতীয় ম্যাকডোনাল্ড' তো পাওয়া যায় বড় বড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক যাত্রীরা সব ট্রেন থেকে নেমে গরম গরম লুচি, আলুর তরকারি, বা ইডলি ধোসা খেতে অভ্যস্ত। এখন ঐ সমস্ত লাইসেন্সড ভেণ্ডারদের তুলে দেওয়ার নীল নকশা তৈরি হচ্ছে। অন্তর্বর্তী রেল বাজেটে জনতা খাবার বিক্রির জন্য ৫১টি জন আহার দোকান খোলার কি হলো? এ বিষয়ে বাজেট রহস্যজনক নীরব থেকেছে।

ভারতের রেল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে

এই বাজেটে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে অনেকগুলো প্রস্তাবের উল্লেখ আছে। এইসব প্রস্তাব কতটা ফলপ্রসূ হবে তা ভবিষ্যতই বলবে। ১৭৮৫ কোটি টাকা শুধু রোড ওভার ব্রীজ ও আণ্ডার ওভার ব্রীজ-এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রহরাবিহীন লেভেল ক্রসিং-এর জন্য কোন বরাদ্দ নেই। এখন দেশে ৩০,৩৪৮টি লেভেল ক্রসিং রয়েছে যার মধ্যে ১১,৫৬৩-টিতে প্রহরী নেই। ২.৫ লক্ষেরও বেশী শূন্য পদ গত দশ বছরে পূরণ হয়নি। এছাড়া গত দশ বছরে ৪ হাজার ট্রেন বেড়েছে, সেই অনুপাতে কর্মী সংখ্যা বাড়েনি। রেলকে সচল রাখতে ৩ লক্ষেরও বেশী কর্মীর প্রয়োজন।

রেল লাইনে ফাটল দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। অন্তত ২০,০০০ কিমি রেলপথ যার ওপর দিয়ে দ্রুতগামী ট্রেন ও মালবাহী ট্রেন যাতায়াত করে এবং ট্রাফিক ঘনত্ব এতই বেশী নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের সময়ই পাওয়া যায় না। অনেক সময়ের ব্যবধানে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে এবং সেটি অনভিজ্ঞ ঠিকেদারই করে থাকে। গ্যাংম্যান (ট্র্যাক মেনটেনার) পদ নিরাপত্তা সম্পর্কিত হলেও ৭৫ হাজার পদ এখনও খালি পড়ে রয়েছে। তাই কাকোদকর কমিটি মন্তব্য করেছে যে রেল যাত্রী সুরক্ষিত নয়—যাত্রী সাধারণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেলে যাতায়াত করেন। জরুরী ভিত্তিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেই নতুন ট্রেন চালু করা উচিত। তাই প্রতিবছর সুরক্ষা খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের সুপারিশ করেছিল উক্ত কমিটি।

মোদী সরকারের বাজেট রেল সুরক্ষার বিষয়ে কোন নতুন দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু লোকাল ট্রেন ও মেইন লাইনে অটোমেটিক দরজা বন্ধের কর্মসূচী রাখা হয়েছে। ৭ হাজার আর পি এফ এবং ৪ হাজার মহিলা আর পি এফ পুলিশ নিয়োগ করা হবে। মহিলা যাত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন মহিলা পুলিশ। আসলে দুর্ঘটনা রোধে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবসম্মত কার্যকরি কোন পদক্ষেপের পরিকল্পনা নেই বাজেটে। মোদী জমানায় দু-দুটো ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল আর ইতিপূর্বে একাধিক ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনে আগুন ও ধোঁয়া চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি লাগুর ব্যাপারে বাজেট নিশ্চুপ। বাতানুকুল কামরায় পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় অনভিজ্ঞ ঠিকা মজদুররাই এসি মেশিন চালায়। ৫টি কোচের জন্য একজন করে মেকানিক থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আসলে দুর্ঘটনার মূল কারণ লুকিয়ে আছে বেসরকারীকরণ ও কর্মী সংখ্যা হ্রাসের মধ্যে। সুরক্ষার প্রশ্নে এফ ডি আই বা পিপিপি-র ওপর ভরসা না রেখে রেল শ্রমিকদের ওপর আস্থা রাখা উচিত হবে। অতীতে দেখা গেছে রেল শ্রমিকের উদ্ভাবনী শক্তির ফলেই রাজধানীর কাপলিং খুলে যাওয়ার মতো ঘটনাকে রোধ করা গেছে।

এই বাজেট কি রেল শ্রমিকদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে?

মোদী জমানায় রেল শ্রমিকদের জন্য আছে শুধু বঞ্চনা আর প্রতারণা। অন্তর্বর্তী বাজেটে যে ২৬টি রেল কর্মীদের জন্য আবাসন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল সেটি বিশ বাঁও জলে। এবারের বাজেটে ৩০১ কোটি টাকা স্টাফ কোয়াটার্সের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কয়েক লক্ষ কোয়াটার্স আছে সেগুলোর ঠিকঠাক মেরামতি করতেই ৬০০ কোটি টাকা দরকার। বহু কোয়াটার্স পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রেল প্রশাসন এখন আর কোয়াটার্স রক্ষণাবেক্ষণ করে না। ছাদ ফুটো, জানালা ভাঙ্গা। এসব কোয়াটার্স রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আউট সোর্সিং হয়ে গেছে। কোয়াটার্স ছেড়ে দিলেও রেলকর্মীদের বাড়ী ভাড়া নানা অজুহাতে আটকে রাখা হয়। নতুন আবাসন তৈরি করার টাকা কোথা থেকে আসবে?

ইঞ্জিন কেবিন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা বিবেচনাধীন আছে। গার্ডদের কেবিনে যেমন টয়লেট আছে, ইঞ্জিনে টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। বাজেট এ বিষয়ে নীরব থেকেছে। সর্বোপরি লোকো পাইলট, সহকারী পাইলট ও গার্ডদের ১০ ঘন্টা কাজ করতে হয়। রানিং স্টাফদের কাজের ঘন্টার বিষয়ে বাজেট কোন মন্তব্য করেনি। যেহেতু মেল/এক্সপ্রেস রাতে যাতায়াত করে, রানিং স্টাফদের দিনের পর দিন বিনিদ্র কাজ করে যেতে হয় এবং রানিং রুমে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। প্রতি বছর কয়েক হাজার রেল শ্রমিক অবসর গ্রহণ করছেন। সেইসব শূন্যপদগুলো পূরণ করা হচ্ছে না, এছাড়াও ৩ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করা হয়নি। ফলত কর্মরত রেল শ্রমিকদের ওপর বাড়ছে অতিরিক্ত কাজের বোঝা ও জুলুমবাজি।

পাশাপাশি চলছে রেলে কর্মরত অসংগঠিত শ্রমিকদের ওপর মধ্যযুগীয় শোষণ। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রণালয় দ্বারা নির্দিষ্ট ন্যূনতম দৈনিক মজুরি যথাক্রমে এ-১ শহরে ৩১০ টাকা, বি-১-এ ২৫৭ টাকা ও সি এরিয়াতে ২০৭ টাকা হওয়া সত্ত্বেও রেল প্রশাসন এ-১ শহরে ১৫০ টাকা ও বি, সি-তে ১০০ বা তার কম মজুরি নিতে বাধ্য করছে। প্রধান নিয়োগকর্তা হওয়া সত্ত্বেও রেল প্রশাসন এইসব ঠিকা শ্রমিকদের জন্য পি এফ, ই এস আই ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষা এবং ৮ ঘন্টা কাজের দাবিকে দিনের পর দিন উপেক্ষা করে চলেছে। প্রতিবাদ বা আন্দোলন করলে ছাঁটাইয়ের হুমকি দেওয়া হয়। রেলের আমলা ও ঠিকাদারদের যোগসাজশে চলছে অন্যায় অত্যাচার। বাজেটে ভারতীয় রেলে কর্মরত ৫/৬ লক্ষ দক্ষ, অদক্ষ বা আধা দক্ষ ঠিকা মজদুরদের সম্পর্কে একটি বাক্যও ব্যয় করা হয়নি। ১৩ লাখ স্থায়ী রেল শ্রমিকদের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃত কোন ইউনিয়নের দাবি—যেমন স্থায়ী কাজে আউটসোর্সিং বন্ধ করা, মহার্ঘভাতা মূল বেতনের সাথে যুক্ত করা ও সপ্তম বেতন কমিশনের বিবেচনাধীন বিষয়গুলো সম্পর্কে বাজেট রহস্যজনকভাবে নীরবতা পালন করেছে। সপ্তম বেতন কমিশনের জন্য আংশিক অর্থও বরাদ্দ করেনি মোদী সরকারের বাজেট।

মোদীর রেল বাজেট আম আদমীর জন্য কোন আশার আলো দেখাতে পারেনি। রেল শ্রমিক ও যাত্রী সাধারণের জন্য অপেক্ষা করছে ঘোর দুর্দিন আর দুর্ভোগ। সুরক্ষিত যাত্রী আর রেল পরিষেবার মান উন্নয়নের দাবিতে এবং ভারতীয় রেলকে কর্পোরেটকরণ ও বেসরকারিকরণ থেকে বাঁচাতে দেশব্যাপী এক সর্বাত্মক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পরিস্থিতির দাবি। উক্ত দিশাতেই রেল শ্রমিক, যাত্রী সাধারণ ও অন্যান্য সংগ্রামী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে দ্রুতই প্রস্তুতি নিতে হবে।

- এন এন ব্যানার্জী

আমেরিকা ও ব্রিটেন সরকার বিরোধী মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে

(মোদী সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের ''বিদেশী হাত'' বলে দোষারোপ করার চেষ্টা করছে। সত্য এটাই যে মনমোহন এবং মোদী সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ''বিদেশী'' অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের গোয়েন্দা ও প্রতিরক্ষা বিভাগের পদানুসরণ করছে। এখানে আমরা গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একজন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক সাংবাদিক ও কৃতী শিক্ষাবিদ ডঃ নাফিজ আহমেদের দুটি প্রবন্ধের সংক্ষেপিত অংশ প্রকাশ করছি যা আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা বিভাগের তরফে শান্তিপূর্ণ ভিন্নমত পোষণকে অপরাধীকরণ করার প্রচেষ্টার বর্ণনা করেছে।)

পেন্টাগণ অসামরিক নাগরিকদের সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিত্রিত করছে

শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও প্রতিবাদ আন্দোলনকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ''কার্যকরি হাতিয়ার'' গড়তে সমাজবিজ্ঞানের সামরিকীকরণ ঘটানো হচ্ছে।

দুনিয়াজোড়া বড় বড় সামাজিক বিক্ষোভগুলোর মধ্যেকার বিপদ সংকেত এবং তার উৎসস্থল চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন মার্কিন সামরিক এজেন্সির অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (ডি ও ডি) গবেষণা প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ ডলার ঢালছে। 'বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কিং সংকট'-এর বছর ২০০৮ সালে ডি ও ডি ''মিনার্ভা গবেষণা উদ্যোগ'' বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ শুরু করে বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে আমেরিকার রণনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আচরণগত ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়াকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে।

২০১৪-তে ১৭ পর্যায়ে যে সমস্ত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি হল 'মার্কিন এয়ারফোর্স অফিস অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ'-এর অধীনে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সমীক্ষা, যার লক্ষ্য হল ''সামাজিক আন্দোলনগুলো, তার জমায়েত এবং প্রভাবিত অঞ্চলগুলোর গতিপ্রকৃতি''-র এক পরীক্ষামূলক মডেল গড়ে তোলা। ''টুইটার পোস্টগুলো'' ও কথোপকথনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা হবে সামাজিক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে যুক্ত হওয়া ব্যক্তিদের এবং কখন ও কিভাবে তারা যুক্ত হয়েছে সেসব চিহ্নিত করার জন্য।

আর একটি প্রকল্প দেওয়া হয়েছে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়কে যার কাজ হল এটা খুঁজে দেখা যে কোন্ পরিস্থিতিতে বড় ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো গড়ে উঠছে এবং তাদের ''বৈশিষ্ট ও পরিণতি'' কি হতে পারে। মার্কিন সেনা গবেষণা দপ্তর পরিচালিত এই প্রকল্প নজর দিচ্ছে ''বড় ধরনের আন্দোলনগুলোর প্রতি যাতে ১০০০-এর বেশী মানুষ অংশ গ্রহণ করছে ও দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে''। মোট ৫৮টি দেশ এর আওতায় থাকবে।

গত বছর প্রতিরক্ষা দপ্তরের (ডি ও ডি) মিনার্ভা উদ্যোগের আর্থিক সহায়তায় শুরু করা প্রকল্পের কাজ হল 'কে একজন সন্ত্রাসবাদী হবে না ও কেন?'' তা নির্ণয় করা, যা আবার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সক্রিয় ব্যক্তি ও ''রাজনৈতিক হিংসার সমর্থক'' ব্যক্তিকে একই সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে, যারা সন্ত্রাসবাদীদের থেকে কেবল সেই অর্থে আলাদা যে তারা নিজেরা ''সশস্ত্র জঙ্গীপনা'' চালাবে না। প্রকল্পটি স্পষ্টভাবেই অ-হিংস রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর সমীক্ষা চালাবে ঃ

''প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা অনেক ব্যক্তিদের দেখছি যারা, যে সব ব্যক্তিরা সন্ত্রাসবাদকে গ্রহণ করায় মনস্থির করেছে, তাদের মত একই ধরণের ভৌগলিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক বা একই আর্থ-সামাজিক পটভূমি থেকেই এসেছে। কিন্তু তারা সশস্ত্র জঙ্গীবাদকে গ্রহণ করেনি যদিও তারা সশস্ত্র গোষ্ঠীদের অন্তিম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সমীক্ষার ক্ষেত্র এই নিয়ন্ত্রণকারি গ্রুপের দিকে নজর দেওয়ার প্রচেষ্টা করেনি। এই প্রকল্প সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত নয়, বরং তাহল রাজনৈতিক হিংসার সমর্থকদের বিষয়ে।''

আমি এই প্রকল্পের প্রধান অনুসন্ধানকারী মার্কিন নাভাল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কুলের অধ্যাপক মারিয়া রাসমুসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন এন জি ও-গুলোর সঙ্গে কর্মরত অহিংস কার্যকর্তাদের রাজনৈতিক হিংসার সমর্থকদের সাথে এক করে দেখা হবে এবং কোন কোন পার্টি এবং এন জি ও-গুলোর ওপর তদন্ত করা হচ্ছে—কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

একইভাবে মিনার্ভা প্রকল্পের কর্মকর্তারা আমার তুলে ধরা একগুচ্ছ অনুরূপ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে অস্বীকার করে। তার মধ্যে এই প্রশ্নটি ছিল শান্তিপূর্ণভাবে এন জি ও-গুলোর পক্ষ থেকে উত্থাপিত ''মৌলিক কারণগুলো'' কিভাবে ডি ও ডি-র কাছে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হচ্ছে?

আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলোর মধ্যে ছিল—

''বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যে প্রতিবাদ ও সামাজিক আন্দোলনগুলো সংগঠিত হয়ে চলেছে সেগুলো কি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ মনে করে? যদি তা মনে করে, তবে কেন? সক্রিয়তা, প্রতিবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অবশ্যই এন জি ও-গুলো গণতন্ত্র এবং সুস্থ নাগরিক সমাজের সজীব উপাদান। তবে কেন প্রতিরক্ষা দপ্তর এই সমস্ত বিষয়গুলো তদন্ত করার জন্য অর্থ প্রদান করছে?

২০১৩ সালে মিনার্ভা ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জিস্ প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্ট ন্যাশনাল ল্যাবেরেটরীর সঙ্গে মিলিতভাবে ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যাণ্ড প্রজেক্টকে টাকা দেয় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কি ধরণের নাগরিক বিক্ষোভ গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য।

মিনার্ভা হল সামরিক মতবাদের গভীর সঙ্কীর্ণমনা ও পরাজিতের মনোবৃত্তির এক মুখ্য উদাহরণ। আরও জঘন্য হল প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের দিক থেকে অধিকাংশ মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার অনীহায় এই সহজ সত্যের প্রকাশ যে তারা এক অতি ক্ষুদ্র অংশের স্বার্থে ক্রমবর্ধমান জনবিরোধী বিশ্বব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার মিশন গ্রহণ করেছে, আর অবশিষ্ট আমাদের সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিত্রিত করায় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কোনরকম বিবেক দংশন নেই।

ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ যুদ্ধ

সামরিকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের স্বপরাজিতের যুক্তি নব্য ''অনিশ্চয়তার যুগে'' পুঁজিবাদ বিরোধী ''চরমপন্থী''-দের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায়।

ব্রিটেনে যে প্রধান ক্ষেত্রে এসব হচ্ছে তা হল রিসার্চ কাউন্সিল ইউ কে গ্লোবাল আনসার্টেন্টিস্ প্রোগ্রাম যাকে সম্প্রতি নয়া নামকরণ করা হয়েছে ''পার্টনারশিপ ফর কনফ্লিক্ট, ক্রাইম এণ্ড সিকিউরিটি রিসার্চ'' নামে। এই প্রকল্পের নেতৃত্বে রয়েছে ইকনোমিক্স অ্যাণ্ড সোস্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং সহযোগীতায় রয়েছে আর্টস এণ্ড হিউম্যানিটিস রিসার্চ কাউন্সিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস রিসার্চ কাউন্সিল। কিন্তু এটা কোন স্বাধীন কর্মকাণ্ড নয়। বরং তাকে নির্দিষ্টভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ''সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজকে'' সাহায্য করার জন্য যাতে পরিবেশগত পরিবর্তন ও ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা, ভৌগলিক পরিবর্তন, দারিদ্র, অসমতা, অপশাসন, নতুন ও পুরানো সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হানাহানি, ডিজিটাল কারিগরির বিস্তার, আর্থিক মন্দা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজনীন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আগত বিপদ সম্পর্কে ভালভাবে সতর্ক করা, নির্ণয় করা, প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়।

আর সি ইউ কে অংশীদারিত্ব তাই গভীরভাবে রাজনৈতিকৃত। তা ব্রিটেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত—যেমন, ব্যবসা বাণিজ্য, উদ্ভাবনী ও শৈলী, কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারি দপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর, গৃহমন্ত্রক এবং আমেরিকা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। এর রণনৈতিক পরামর্শদাতা বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন স্যার রিচার্ড মটরাম হোয়াইট হলের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরগুলোর এক দীর্ঘকালীন কর্মকর্তা—প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা। স্যার মটরাম অনুমোদিত ব্রিটিশ সরকারের প্রতিরক্ষা পর্যালোচনা যার নাম দেওয়া হয়েছে ''অনিশ্চয়তার যুগে ব্রিটেনের সুরক্ষা ব্যবস্থা''—তাতে তুলে ধরা হয়েছে সম্পদের জন্য বেড়ে চলা প্রতিযোগিতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে। অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে ''বাণিজ্য ও শক্তি সরবরাহ পথকে সুরক্ষিত করা'', যা বাইরের দেশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাজনৈতিক, সামরিক, গোয়েন্দা ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে ব্যবহার করে শক্তি সরবরাহ পথের বাধাবিঘ্নকে সামলাতে হবে। এছাড়াও ''অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রেও যেমন বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূল উপাদান—যথা বিরল ধাতুসমূহ ইত্যাদি, জল ও খাদ্যশস্য ইত্যাদির সরবরাহ সুরক্ষিত করার জন্য তৎসংক্রান্ত বিপদ-আপদ মোকাবিলা করা।

দেশের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশগত বিপর্যয় অথবা অন্যান্য রণনীতিগত ধাক্কার মোকাবিলার সিভিল কন্টিনজেন্সী অ্যাক্ট-এর অসাধারণ সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে ''বর্ধিত কেন্দ্রীয় সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর পরিকল্পনা, সহযোগ ও ক্ষমতা''র কথা সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

আশ্চর্যের কিছু নয় যে এখন ব্রিটিশ সমাজ বিজ্ঞানীদের ওপর বেশ চাপ পড়েছে। আন্ত-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক দপ্তরকে প্রশাসন বান্ধব ''সিকিউরিটি স্টাডিজ''-এর কনভেয়ার বেল্টে পরিণত করা হচ্ছে। কেবল ব্যবহারিক নীতি ও কার্যকরি উপযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়েই গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। আর এর মধ্যে স্বাধীন সমালোচনামূলক ও সংশয়বাদমূলক গবেষণা যা একজন বিচক্ষণ পণ্ডিতের উৎকর্ষ চিহ্ন হওয়া উচিত সেসব অবহেলা করা হচ্ছে।

এইসব আশঙ্কার বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। ২০০৭ সালে গার্ডিয়ান পত্রিকা এক অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টে দেখিয়েছে কিভাবে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে বিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে গবেষণার জন্য।

এই ধরণের গবেষণার পেছনে যে মতাদর্শগত প্রেরণা কাজ করেছে তা খুঁজে পাওয়া যাবে বিশ্বব্যাপী রণনৈতিক প্রবণতা সংক্রান্ত ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রিপোর্ট থেকে যা ২০১০ সালে বেরিয়ে ছিল আবার ২০১৩ সালে নবীকৃত হয়েছিল, যার অবদান রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের ডিফেন্স গ্রীণ পেপারের ক্ষেত্রে।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের ''ডেভেলপমেন্ট, কনসেপ্ট এণ্ড ডকট্রিনস সেন্টার''-এর রিপোর্টের মূল বক্তব্য হল—দুনিয়া এক পরিবর্তনশীল জলবায়ু, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পদের অভাব, মতাদর্শের পুনরুত্থান এবং বিশ্বক্ষমতা কেন্দ্র ২০৪০-এর মধ্যে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে স্থানান্তরণ—এসব বাস্তবতার সম্মুখীন হতে চলেছে।

যদিও, ভুবনায়ন ''সম্ভবত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়া চালিকা শক্তি'', রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তা আবার হতে পারে ''বিপদের উৎস, কারণ স্থানীয় বাজার বেশি বেশি করে বিস্তৃত বিশ্ব বাজারের অস্থিতিশীল ওঠানামার সম্মুখীন হয়ে পড়বে। অর্থনৈতিকভাবে ভুবনায়ন বিজয়ী এবং পরাজয়ী উভয়ই সৃষ্টি করতে পারে বিশেষ করে শ্রম বাজারের ক্ষেত্রে।''

ভুবনায়ন সম্ভবত লাভজনক হতে পারে ''ভুবনায়িত কেন্দ্রস্থল, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা আন্তর্নির্ভরশীল ও অর্থনৈতিকভাবে সফল অঞ্চলগুলো তাদের জন্য।'' তবে রিপোর্ট কেন্দ্রস্থলে নাগরিক অসন্তোষের বিপদের কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছে ঃ ''ভুবনায়িত কেন্দ্রস্থলে অস্থায়িত্ব প্রধান প্রধান শক্তিগুলোর জাতীয় স্বার্থের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে।'' আরও ব্যাপার হল ভুবনায়িত কেন্দ্রস্থলের দেশগুলোর সুরক্ষা বাহিনীকে উৎপাদনের সম্পদ ও টেকনোলজির ওপর তাদের প্রভুত্বকে রক্ষা করতে হবে।

''সম্পদ সমূহ, ব্যবসা বাণিজ্য, পুঁজি ও মেধা সম্পদকে এই কেন্দ্রস্থল দিয়ে প্রবাহিত হতে হবে এবং ভৌতিক ও কার্যকরি ক্ষমতা-সম্পন্ন জটিল নেটওয়ার্কের ওপরও নির্ভর করতে হবে—যার মধ্যে রয়েছে ''আকাশ ও সমুদ্রপথ ও তার সঙ্গে যুক্ত বন্দর, রেল ও সড়ক পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ পাইপ লাইন ও কেবল্, খাদ্য বণ্টন কেন্দ্র, ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক তালুক, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান পার্ক, ম্যানুফ্যাকচারিং ও শক্তি উৎপাদন সংস্থাগুলো'' সুতরাং ''দুনিয়াজোড়া এই সমস্ত পরিকাঠামোগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজ বহুপাক্ষিক স্বার্থেই করতে হবে।'' যেখানে বিশ্বের মাত্র ১৪৭ সর্ববৃহৎ ক্ষমতাশালী কোম্পানির এক ঘন সন্নিবিষ্ট নেটওয়ার্ক যা বিশ্বের উৎপাদক সম্পদের মালিক ও নিয়ন্ত্রক সেখানে এই রিপোর্ট হল প্রকৃতপক্ষে ১ শতাংশ (সম্ভবত আরও সঠিকভাবে বললে ০.১ শতাংশ) মানুষের জন্য সুরক্ষা ইস্তাহার।

যদিও বিশ্বের যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি, খাদ্য ও পরিষ্কার জলসম্পদের উৎপাদন হচ্ছে, এম ও ডি রিপোর্ট বলছে—''ঐ সম্পদের বন্টন ও লভ্যতা হবে অসম''—দরিদ্রতর প্রান্তসীমার জনগণের বিপরীতে ধনী কেন্দ্রস্থলের হাতেই কেন্দ্রীভূত হবে—''স্থানীয় ও আঞ্চলিক ঘাটতি দেখা দেবে। সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং রাজ্যে রাজ্যে মতভেদ বৃদ্ধি পাবে যার ফলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যেতে পারে।''

রিপোর্টের সর্বাপেক্ষা গোলমেলে ব্যাপার হল প্রান্তিক সীমাস্থিত বিদেশী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং কেন্দ্রস্থিত বৈদেশিক বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত নিরাপত্তাকরণ। ''বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা''-য় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অস্থিতিশীলতায় ইন্ধন জোগাতে পারে 'অসন্তুষ্ট যুবক বাহিনী'র এক মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলে। বিশেষ করে সীমিত আর্থিক সম্ভাবনাময় যুবকরা র‍্যাডিকালাইজেশনের দিকে ঝুঁকে যেতে পারে।''

রিপোর্টে নগরগুলোর দুর্বলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, ''বৃহৎ শহরাঞ্চলগুলো'' যেখানে শাসন ব্যবস্থা খুব খারাপ সেখানে অপরাধ প্রবণতা ও অসন্তোষ বেড়ে যায়, আর তার ফলে তা ''চরমপন্থী মতাদর্শের লক্ষ্যবিন্দু হতে পারে। তার ফলে গ্রামীণ বিদ্রোহের বদলে শহরাঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেতে পারে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙে যেতে পারে। এইখানে এম ও ডি সরাসরিভাবে বর্তমান আমেরিকার ধাঁচে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার পক্ষে ওকালতি করেছে। নগর

আটের পাতায় দেখুন

ঘটনা ও প্রবণতা

নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের শীর্ষে

নারী নির্যাতনে দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করল পশ্চিমবঙ্গ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্টে এই তথ্য জানা গিয়েছে। ২০১৩ সালের রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১৮ হাজার ১১৬টি। সেখানে দু-নম্বরে থাকা রাজস্থানে এই সংখ্যা ১৫ হাজার ৯৪। তিন নম্বরে থাকা অন্ধ্রপ্রদেশে এক বছরে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১৫ হাজার ৮৪টি।

নারী অপহরণের ঘটনাতেও উপরের দিকেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিহার, অসম, রাজস্থানের পরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত বছরে রাজ্যে এ ধরণের অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৩ হাজার ৮৩০টি।

পণের বলি হওয়ার ঘটনাতেও উপরের দিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের পরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে পণের বলি হয়েছেন ৪৮১ জন। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ১ হাজার ৬৮৫টি। গোটা দেশে নথিভুক্ত ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যা ৩৩ হাজার ৭০৭টি। শীর্ষে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ।

—বর্তমান, ৩ জুলাই ২০১৪

কেন্দ্রীয় অর্থের অর্ধেক খরচ হয়নি

বাম আমলের দেনা মেটাতে গিয়েই সর্বস্বান্ত, ফলে রাজ্যে উন্নয়নের গতিতে টান পড়ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত তিন বছর ধরেই অনুযোগ করে আসছেন। এর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেনা মেটানোর জন্য মোরেটোরিয়ামেরও দাবি তুলেছেন। কিন্তু তাঁর সেই দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) রিপোর্ট। সম্প্রতি পেশ হওয়া ঐ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অনুদান বাবদ কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ শতাংশও খরচ করতে পারেনি রাজ্য।

ক্যাগ বলছে, ২০১২-১৩ পর্যন্ত ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন রাজ্যকে সাতটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ৯৫২৮ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছিল। পঞ্চায়েত, পুরসভা, সর্বশিক্ষা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অধীনে ত্রাণ, রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের জন্য এই অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়। সর্বশিক্ষায় অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছিল ১২৫১ কোটি টাকায়। কেন্দ্র তা দিয়েও দেয়। ঐ খাতে রাজ্য খরচ করতে পেরেছে অবশ্য মাত্রই ৭৭১ কোটি টাকা। রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণে ৩০৭ কোটি টাকা পেয়েও ৯২ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি সরকার। পুরসভার কাজের নিরীখে কমিশন সুপারিশ করেছিল ২০০ কোটি টাকা। কেন্দ্র শেষ পর্যন্ত ১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। রাজ্য সরকার সেই বরাদ্দের এক পয়সাও খরচ করতে পারেনি। এভাবে অর্থ কমিশনের সুপারিশ মতো মোট ৯৫২৮ কোটি টাকার মধ্যে ২০১২-১৩ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৭১৩৩ কোটি পেয়েও রাজ্য খরচ করেছে মোটে ৩৫০৮ কোটি টাকা, ৫০ শতাংশেরও কম। খরচ হয়নি ৩৬২৫ কোটি টাকা।

আগের বছরের দেওয়া টাকা খরচের হিসেব বার বার চেয়েও পায়নি কেন্দ্র। হিসেব আদায়ে জন্য শেষে রাজ্যের একাধিক দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ আটকে দেওয়ার পথে হেঁটেছে তারা। এর ফলে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫৮৯ কোটি ১ লক্ষ টাকা হাতে পায়নি রাজ্য।

ক্যাগের এই রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট, আর্থিক সঙ্কট যেমন মিথ্যে নয়, তেমনই সত্যি কেন্দ্রের টাকা খরচে রাজ্যের ব্যর্থতাও।

বরাদ্দ আর খরচ এক নজরে

রাজ্যের দপ্তর	ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ	কেন্দ্রীয় বরাদ্দ	খরচ হয়েছে	খরচ হয়নি
পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতকে অনুদান	৫৯১৯	৪২০২	২২৩২	১৯৭০
প্রাকৃতিক বিপর্যয় ত্রাণ	৭৩৬	৭৩৬	১	৭৩৫
পরিবেশ সংক্রান্ত অনুদান	১৮৮	১১৪	৬৭	৪৭
সর্বশিক্ষা অভিযান	১২৫১	১২৫১	৭৭১	৪৮০
রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ	৩০৭	৩০৭	২১২	৯৫
রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের নির্দিষ্ট অনুদান	৮৫২	৪২৩	২১১	২১২

—এই সময়, ১৩ জুলাই ২০১৪

ডাক্তার তৈরিতে পিছিয়েই পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদন হারানো এম বি বি এস আসনগুলো সদ্য ফেরত পেয়েছে রাজ্য। কিন্তু ডাক্তার তৈরির দৌড়ে এ রাজ্য ঢের পিছিয়ে জাতীয় গড়ের চেয়েও। সারা দেশে যেখানে গড়ে ১৮০০ মানুষ-পিছু একজন চিকিৎসক, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক-জনতার অনুপাত প্রায় ২৩০০।

দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়টি রাজ্য সরকার অবহেলা করে আসার মাশুলই এখন দিতে হচ্ছে। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, গোটা দেশের তুলনায় এ রাজ্যের একজন চিকিৎসকের ঘাড়ে অতিরিক্ত ৫০০ মানুষের চিকিৎসার ভার চাপছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার একমাত্র রাস্তা—আগামী এক দশকের মধ্যে রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত দ্বিগুণ করা। অন্যথায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু' নির্ধারিত চিকিৎসক-জনতার অনুপাত ১ঃ১০০০-র লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে সারা দেশের তুলনায় কমপক্ষে আরও ২০-২৫ বছর বেশি লেগে যাবে রাজ্যের।

কারণ এ রাজ্যে আপাতত চিকিৎসকের সংখ্যা মোট ৪৩ হাজার। 'হু' নির্ধারিত লক্ষে পৌঁছাতে ২০৩১ সাল নাগাদ প্রয়োজন হবে কমপক্ষে আরও ৬৫ হাজার চিকিৎসকের। এ দিকে বর্তমানে মাত্র ১৭টি মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে মোটে ২৪৫০টি এম বি বি এস আসন। এইমস সহ রাজ্যে পাঁচটি কেন্দ্রীয় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। ১০০ আসনবিশিষ্ট প্রস্তাবিত এই আটটি মেডিক্যাল কলেজ তর্কের খাতিরে যদি আগামী বছরেও তৈরি হয়ে যায় (যা বাস্তবে অসম্ভব), তা হলেও ৬৫ হাজার চিকিৎসক তৈরিতে এ রাজ্যের অন্তত ৪০ বছর (অর্থাৎ ২০৫৫ সাল) লেগে যাবে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা যদি বর্তমানের দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়, তা হলেই একমাত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারা যাবে।

চিকিৎসক চিত্র

● দেশের চিকিৎসক-জনতা অনুপাত ১ঃ১৮০০। ২০৩১ সালের মধ্যে জাতীয় অনুপাত ১ঃ১০০০ করতে চায় কেন্দ্র। এ জন্য আরও ৩০০টি মেডিক্যাল কলেজ দরকার। আছে ৩৮১টি।

● রাজ্যে বর্তমান অনুপাত ১ঃ২৩০০। ১৭টি মেডিক্যাল কলেজে আসন ২৪৫০টি। প্রয়োজন দ্বিগুণ কলেজের।

● সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে কর্ণাটক (১ঃ১৪০০), মহারাষ্ট্র (১ঃ১৬০০) ও তামিলনাড়ু (১ঃ১৬৫০)। কর্ণাটকে ৪৬টি মেডিক্যাল কলেজে ৬৭৫৫টি, মহারাষ্ট্রে ৪৪টি মেডিক্যাল কলেজে ৫৯৪৫টি এবং তামিলনাড়ুতে ৪৫টি মেডিক্যাল কলেজে ৬০১৫টি এম বি বি এস আসন রয়েছে।

—এই সময়, ১৮ জুলাই ২০১৪

প্যালেস্তাইন ... সংগ্রাম

পাঁচের পাতার পর

মাধ্যমে প্যালেস্তাইনকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলোতেই ভারত ও প্যালেস্তাইনের সখ্য শুরু হয়। কিন্তু সেসব এখন অতীত। বর্তমান ভারত সরকার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনতেও নারাজ। দেশের প্রায় সবকটি শহরে হাজারে হাজারে মানুষ ইজরায়েলী হানার বিরুদ্ধে ও প্যালেস্তাইনের মুক্তির সপক্ষে রাস্তায় নেমে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে ও দেশের সরকারের সদর্থক ভূমিকা দাবি করেছে। সংসদেও অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নিন্দা প্রস্তাবের দাবি তুলেছে। কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে বৈদেশিক নীতির ওপর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব পড়তে দেবে না। এ কথার একটাই অর্থ। বৈদেশিক নীতি কি হবে না হবে সে বিষয়ে দেশের মানুষের বা অন্য রাজনৈতিক দলের কিছু বলার অধিকার নেই। অথবা, দেশের অভ্যন্তরে শাসন পদ্ধতির সাথে আজ আর বিদেশের আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নীতি খাপ খায় না। ইজরায়েল রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে আত্মচরিতার্থতাকামী উগ্র জাতীয়তাবাদের মডেল। ইজরায়েল কেবলমাত্র নিত্য-নতুন যুদ্ধাস্ত্র-কারিগরী রপ্তানীর হাতিয়ার নয় আর। বরং যে কোন মূল্যে, মানব সভ্যতার যে কোন সদর্থক অর্জনকে নস্যাৎ করে, আন্তর্জাতিক আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে উচ্চকোটির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয়-কারিগরী সরবরাহের সাম্রাজ্যবাদী মাধ্যম ইজরায়েল। একটি দেশের সমগ্র অধিবাসীকে সন্ত্রাসবাদী সাজিয়ে নৃশংস উচ্ছেদ চালানোর সরকারি প্রকৌশল আধুনিক রাষ্ট্রগুলো শিখছে ইজরায়েল থেকে, আমাদের দেশে যা অপারেশন গ্রীণ হান্টে প্রকাশ পেয়েছে।

জায়নবাদ ও হিন্দুত্ববাদ একই কিসিমের জাতিয়তাবাদ। ইজরায়েলের এক মহিলা সাংসদকে আমরা বলতে শুনলাম যে প্যালেস্তাইনের সমস্ত মায়েদের নিকেশ করে ফেলা উচিৎ কারণ ঐসব মায়েরা সন্ত্রাসবাদীর জন্ম দেয়। আমাদের দেশে আরওয়াল, বাথে, বাথানি ইত্যাদি নরসংহারে দলিত মায়েদের নিকেশ করা হয়েছিল একই হুঙ্কার সহ, বলা হয়েছিল এইসব মায়েরা নকশাল জন্ম দেয়। বীরদর্পী ইজরায়েলী বোমারু বিমানগুলো প্যালেস্তিনীয়দের জীবন কীভাবে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে তার লাইভ উল্লাস শো আয়োজন করেছে জায়নবাদীরা। গাজা সীমান্তে পাহাড়ের ওপর চেয়ার পেতে—এই দৃশ্যের জন্ম হতে দেখলাম আমরা—যেমন দেখেছিলাম বিধর্মী নারীকে বলাৎকার-হত্যা করে ঘরে ফেরা সন্তানকে বিজয় তিলক পরিয়ে দিয়েছে গুজরাট মডেলের হিন্দুত্ববাদী মাতা। **- মলয় তেওয়ারি**

... বিরোধী মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

সাতের পাতার পর

সমাজের মধ্যকার অস্থিতিশীলতাকে চিহ্নিত করা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আরও ভাল বোঝাপড়া থাকতে হবে। ধর্ম, জাতি-বিভাজন, জাতীয়তাবাদ, বৈষম্য অথবা এ সমস্ত কিছুর মিলিত ক্রিয়ার ফলে নতুন মতাদর্শের সৃষ্টি হতে পারে। মতাদর্শগত সংঘর্ষের জন্ম হতে পারে এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীরা তাকে হিংসামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে ''চরমপন্থী গোষ্ঠী''-র বহুবিধ উল্লেখ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তাদের চরমপন্থী চরিত্রের ধারণার সঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিন্ন সম্পর্ক নেই। তাহলে কি তাদের চরমপন্থীতে পরিণত করছে? এই পয়েন্টে এম ও ডি রিপোর্ট অস্বচ্ছ। কিন্তু বিষয়বস্তু থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে যেকোন গোষ্ঠী ''ভুবনায়িত কোর''-এর প্রভুত্ব চ্যালেঞ্জ করতে বড় ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কার্যকলাপ চালালেই তারা চরমপন্থী।

সুতরাং বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরোধী মতাদর্শই হল চরমপন্থী বা র‍্যাডিকাল এবং ধরে নেওয়া হবে যে তারা রাজনৈতিক হিংসায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে, পশ্চিমে ''বৈদেশিক বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়''—কালো ও সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বার জনগণকে নরমভাবে যা বলা হয়—এরা বিশেষভাবে 'অসন্তোষের মজুত বাহিনী'-তে পরিণত হবে কারণ পুঁজিবাদী ভুবনায়ন বিজয়ী এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যকার বৈষম্যকে গভীরতর করে চলেছে এবং তারা বিদেশী স্বার্থের পক্ষে পঞ্চম বাহিনীর কাজ করবে।

যদিও এখানে ভাষাকে যত্ন সহকারে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে তবু তার জাতিবিদ্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী হাবভাব নজর এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। আগামী দশকগুলোতে মুসলিম, অভিবাসী, বিদেশীরা এবং রাজনৈতিক কর্মীরা সকলেই সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী এবং তাই সবার ওপর নজর রাখা হবে।

মূল ধারণা হল যে, মানব ইতিহাসে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাই হল সম্ভাব্য সর্বাধুনিক সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, আর তাই তাকে বর্তমান কাঠামো সহ যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

সবশেষে এটাই ইঙ্গ-আমেরিকান নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিশ্বাস করে যে কেন্দ্রে এবং প্রান্তসীমায় বসবাসকারী সাধারণ জনগণ 'চরমপন্থী'দের খপ্পরে পড়ে যাবে কারণ বিশ্ব পুঁজিবাদের সাধারণ কার্যকলাপে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা এক শক্তিশালী ক্ষুদ্র অংশের কুক্ষীগত হবে যারা এই গ্রহের সমস্ত উৎপাদক সম্পদের ওপর কব্জা জমিয়েছে, আর তার ফলে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভের জন্ম হবে। আর এই বিপজ্জনক অসন্তোষের মূল কেন্দ্রের চারদিকে থাকবে রাজনৈতিক কর্মী, নাগরিক সমাজগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ।

বিশ্ব পুঁজিবাদের অস্থিরতা যত বৃদ্ধি পাবে ''সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'' ততই ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে যাবে ''ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে''—''সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে''—যারা বর্তমান রূপে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে অথবা তার দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এই পৃথিবীতে যেখানে ৮৫ জন লোক একত্রে ১ ট্রিলিয়ন ডলার সম্পত্তির মালিক যা সারা পৃথিবীর নীচের দিকের অর্ধেক সংখ্যক জনগণের সমস্ত সম্পত্তির মূল্যের সমান—বলা ভাল এর মধ্যে আমরা সকলেই পড়ছি।

(''লিবারেশন'' জুলাই ২০১৪ থেকে ভাষান্তরিত)

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com